জামির কাব্যে রাসুল (স.) ও আহ্‌ল-ই-বায়ত ঃ প্রশস্তি ও স্বরূপ

Praise and Essence of Rasul (sm.) and the Ahl-e-Bait in the Diwane Jami

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

লায়লা খালেদা রিমি
এম. ফিল গবেষক
রেজিঃ নম্বর ৩০৬/২০১৩-২০১৪
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এম. ফিল গবেষক লায়লা খালেদা রিমি কর্তৃক জামির কাব্যে রাসুল (স.) ও আহ্‌ল-ই-বায়ত ঃ প্রশস্তি ও স্বরূপ Praise and Acsence of Rasul (sm.) and the Ahl-e-Bait in the Diwane Jami শীর্ষক এম. ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এ গবেষণাকর্মটি লায়লা খালেদা রিমি-এর নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম হিসেবে রচিত ও উপস্থাপিত হয়েছে। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এম. ফিল বা অন্য কোনো ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো ধরণের গবেষণাকর্ম রচিত হয়নি।

আমি এ অভিসন্দর্ভটি পুরোপুরি পাঠ করেছি এবং এম. ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

(প্রফেসর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান)
তত্ত্বাবধায়ক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

(প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন)
যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি লায়লা খালেদা রিমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, জামির কাব্যে রাসুল (স.) ও আহ্‌ল-ই-বায়ত ঃ প্রশস্তি ও স্বরূপ Praise and Acsence of Rasul (sm.) and the Ahl-e-Bait in the Diwane Jami শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি আমি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান এবং যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন-এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনা মোতাবেক রচনা করেছি।আমি এ অভিসন্দর্ভটির কোনো অংশ বা পুরোপুরি কোথাও সনদ লাভ বা প্রকাশের জন্য জমা দেইনি।

এই মর্মে আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমি রচিত এবং দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভে কোনো Plagiarism নেই।

তারিখ:

(লায়লা খালেদা রিমি)
এম. ফিল গবেষক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৩০৬
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়ন পত্র	ii
ঘোষণাপত্র	iii
ভূমিকা ও অধ্যায় পরিচিতি	৫-৮
প্রথম অধ্যায়	
মওলানা আব্দুর রহমান জামীর জীবন ও কর্ম	৯-৪৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	
আব্দুর রহমান জামির (র.) রচনাবলি ও কবিমানস	৪৭-৬৯
তৃতীয় অধ্যায়	
আব্দুর রহমান জামির (র.) কাব্য সাহিত্যে রসূল (স.)-এর প্রশংসা	৭০-৮৩
চতুর্থ অধ্যায়	
জামির (র.) গদ্য সাহিত্যে রসূল (স.)-এর প্রশংসা	৮৪-১১১
পঞ্চম অধ্যায়	
রাসুল (স.) এর বাণী ও পবিত্র কুরআনে আহলে বাইত	১১২-১১৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	
জামির (র.) কাব্যে আহলে বাইত এর প্রশস্তি ও স্বরূপ	১২০-১৩০
উপসংহার	১৩১-১৩৩
টীকা, তথ্যনির্দেশ ও গ্রন্থপঞ্জি	১৩৪-১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা ও অধ্যায় পরিচিতিঃ

ফারসি ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যাঁরা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে নুরউদ্দিন আব্দুর রহমান জামি অন্যতম। তিনি ছিলেন জগৎ বিখ্যাত মুসলিম কবি। মোল্লা জামি বা মাওলানা জামি নামে খ্যাত এই কবিকে ফারসি ভাষার শীর্ষস্থানীয় মরমি কবি বলে মনে করা হয়। তাঁর সম্পর্কে সম্রাট বাবর লিখেছেন, গুপ্ত ও ব্যক্ত বিদ্যায় সমসাময়িক যুগে জামির সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না। মাধুর্য ও সারল্য ছিল তার কবিতার ভূষণ। তার কবিতা কষ্টকল্পিত বা কৃত্রিম নয়। মানব জীবনে আধ্যাত্মিক অনুভূতি আত্মার সহজাত, চিরন্তন ও অনির্বচনীয় এক অনুভূতি; যা সকলেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। মানবের অনুভূতির প্রাবল্যে যখন তার আত্মা ও হৃদয়কে আধ্যাত্মিক অনুভূতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, ঠিক তখনই মানব হৃদয়ে এর গূঢ় রহস্য উদ্‌গাটন সম্ভব হয়। এ ফলে মানব হৃদয় প্রশান্তি প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। যুগে যুগে এমন অনেক মনীষীর পৃথিবীতে আগমন ঘটেছে যাঁরা চেষ্টা, সাধনা, সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকারে নিজের জীবন মানবের তরে উৎসর্গ করেছেন। জীবনের সকল লোভ লালসা ত্যাগ করে মহান আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার মাধ্যমে তাঁরা সাধক হিসেবে পরিচিত হন। বিশ্বখ্যাত সাধকদের মধ্যে হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (র.), রাবেয়া বাসরি (র.), ইবনুল আরাবি (র.), হযরত হাসান বাসরি (র.), হযরত শাহ মখদুম (র.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ফারসি কবিদের মধ্যে মওলানা জালালুদ্দিন রুমি (র.), মওলানা ফরিদুদ্দিন আত্তার (র.), হাফিজ শিরাজি আব্দুর রহমান জামি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য সুফি কবি হিসেবে পরিচিত। এঁদের রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো যুগ যুগ ধরে মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করে যাচ্ছে। তাঁদের জ্ঞানের আলোকচ্ছটায় পথভ্রষ্ট মানুষ আজো পথে দিশারি হচ্ছে। আল্লাহ ও রাসুলের প্রশংসা উপজীব্য করে মওলানা আব্দুর রহমান জামি রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো সাধারণ মানুষের মাঝে অতি পরিচিত ও সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। আমার এম. ফিল অভিসন্দর্ভের শিরোনামে আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোনো মৌলিক গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এ কারণেই ফারসি কাব্য সাহিত্যে মরমি বিষয় বিশেষ করে নবি-রাসুলের প্রশংসা বিষয়ক রচনার অভাব পূরণার্থেই এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের প্রয়াস পেয়েছি। আমার রচিত অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা ও অধ্যায় পরিচিতি এবং উপসংহারসহ মোট সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে; যাতে মূল বিষয়বস্তু ও আলোচনার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে । অধ্যায়গুলো হলো-

ভূমিকা ও অধ্যায় পরিচিতি

প্রথম অধ্যায়: মওলানা আব্দুর রহমান জামীর জীবন ও কর্ম

দ্বিতীয় অধ্যায়: আব্দুর রহমান জামির (র.) রচনাবলি ও কবিমানস

তৃতীয় অধ্যায়: আব্দুর রহমান জামির (র.) কাব্য সাহিত্যে রাসুল (স.)-এর প্রশংসা

চতুর্থ অধ্যায়: জামির (র.) গদ্য সাহিত্যে রাসুল (স.)-এর প্রশংসা

পঞ্চম অধ্যায়: রাসুল (স.) এর বাণী ও পবিত্র কুরআনে আহলে বাইত

ষষ্ঠ অধ্যায়: জামির (র.) কাব্যে আহলে বাইত এর প্রশস্তি ও স্বরূপ

উপসংহার

অভিসন্দর্ভের শুরুতেই গবেষণাকর্মের তত্ত্বধায়কবৃন্দের প্রত্যয়নপত্র, গবেষকের একটি ঘোষণাপত্র সংযোজন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের শেষাংশে গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত রয়েছে। আমার অভিসন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাসুল (স.)-এর প্রশংসার রূপকার জামির সাথে গভীর পরিচয় এবং বাংলা ও ফারসির আত্মীয়তার সুবাদে বিশ্ব মুসলিমের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করা। সর্বোপরি নিখিল সৃষ্টির সুন্দরতম ফুল প্রিয় রাসুল (স.)- অনুপম চরিত্রের সুন্দর দিকগুলোকে নতুন আঙ্গিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা, যা বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষকে আপ্লুত করবে, আমাদের ভাষা ও সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। আমার গবেষণাকর্মটি বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রচলিত সর্বাধুনিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে রচিত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের ভূমিকা অংশটিতে ফারসি কাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে মাওলানা আব্দুর রহমান জামির সমসাময়িক যুগের ফারসি কাব্যের উপর বিস্তারিত আলোকপাত রয়েছে।

১ম অধ্যায় : ১ম অধ্যায়ে আব্দুর রহমান জামির জীবন, বংশ পরিচয়, কর্ম, শিক্ষাজীবন, সুফি দর্শন, পারিবারিক জীবন, দেশভ্রমণ, ইন্তেকাল, সমাধি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে ।

২য় অধ্যায় : ২য় অধ্যায়ের জামির রচনাবলি, তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু, তাঁর আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। ফারসি কাব্য ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি মাওলানা আব্দুর রহমান জামি কবিতা ও সাহিত্যে সমান দক্ষতার অধিকারি ছিলেন। তিনি জীবনের বেশির ভাগ অংশ কাব্যচর্চা ও সাহিত্য রচনায় অতিবাহিত করেন। তাঁর রচনার মূল প্রতিপাদ্য আল্লাাহ ও রাসুল প্রেম, তাফসির, ফিকাহ, হাদিস, আরবি ব্যাকরণ অলংকার শাস্ত্র, ধাঁ ধাঁ, তাসাওফ এবং ইসলামের সৌন্দর্য ও নৈতিক শিক্ষাসমূহের মনোজ্ঞ বর্ণনা এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। জামি রচিত বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক এ অধ্যায় সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

৩য় অধ্যায় : ৩য় অধ্যায়ে কুরআন ও হাদিসের আলোকে রাসুল (স.)-এর মাহাত্ম্যকে তুলে ধরা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল ও প্রিয় বান্দা। নজরুলের ভাষায় 'ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ', গোলাম মোস্তফার ভাষায় 'নিখিলের ধ্যানের ছবি।' তাঁকে ভালবাসা ও তাঁর গুণগান করা, বিশেষ তাগিদ এসেছে কুরআন শরিফে। কাজেই ইসলামের মর্মকথঅ গভীরভাবে জানতে, মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অনুধাবন করতে, রাসুল (স.)-এর ভালবাসার বলয়কে, মুসলিম মন ও মানসকে পরিশিলিত করতে এবং সর্বোপরি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানবের চরিত্রের আলোতে মানব জীবন ও সভ্যতাকে আলোকিত করার প্রয়োজনে এ অধ্যায়টি জামির মরমি সাহিত্যের আলোকে সাজানো হয়েছে।

৪র্থ অধ্যায় : ৪র্থ অধ্যায়ে জামির কাব্যে রাসুল (স.)-এর শান, মাকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। জামির সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি নাতে রাসুল (স.)-বা রাসুল (স.)-এর প্রশংসার এক বিশাল শামিয়ানা টানিয়েছেন, যার ছায়াতলে দুনিয়ার সকল রাসুল (স.)-এর প্রেমিক মুসলমানগণ ভক্তি ও ঈমানের ভাবরসে আপ্লুত হতে পারেন; এ লক্ষ্যেই জামি রচিত নানা তথ্য উপাত্ত সমৃদ্ধ রচনাবলির আলোকে রাসুল (স.) এর প্রশংসা সম্বলিত লেখা এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

ম অধ্যায় : অভিসন্দর্ভের এই অধ্যায়ে কুরআন ও হাদিস শরিফের আলোকে আহলে বাইতের মর্যাদা সর্ম্পকে বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। রাসুল প্রেমের পরিপূর্ণতার সাথে আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা যে অতঃপ্রতভাবে জড়িত তা এখানে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় : রাসুল প্রেমের সাথে সাথে মওলানা জামি (র.) আহলে বাইতের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও প্রদর্শন করেছেন। এই অধ্যায়ে জামির কাব্যে আহলে বাইত এর প্রশস্তি ও স্বরূপ এর উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সবশেষে উপসংহার যাতে পুরো গবেষণাকর্মটির ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে।

এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, ঢাকাস্থ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর লাইব্রেরি, বেগম সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারসহ অন্যান্য এ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি ব্যবহারপূর্বক তথ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এসকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের সহযোগিতার জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করত ইন্টারনেট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি; যাঁদের হাত ধরেই আমার ফারসি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার হাতে-খড়ি। বিশেষ করে, আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষাগুরু প্রফেসর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান; যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে সময়, পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা দিয়ে উৎসাহিত করেছেন, তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এছাড়া আমার গবেষণাকর্মের যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক, বিভাগীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন স্যারের নিকট আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও অন্তরের অন্তঃস্থল হতে পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি; যিনি সদাসর্বদা আমার গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্র-উপদেষ্টা সহযোগী অধ্যাপক জনাব আহসানুল হাদী স্যারের প্রতি; যিনি আমার গবেষণাকর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা, পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে ভূমিকা পালন করেছেন। বিভাগীয় অফিসে কর্মরত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই বিশেষ করে সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল ভাইয়ের কথা না উল্লেখ করলেই নয়; যিনি শত ব্যস্ততার পরেও আমাকে অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও আরো অন্যান্য যেসব ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে নানান পর্যায়ে আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার শিক্ষানুরাগী পিতা-মাতা; যাঁরা সর্বদা আমার অধ্যয়নে সহযোগিতা, সৎ পরামর্শ, চেষ্টা, শ্রম, সাধনা ও দোয়ার মাধ্যমে আমার সাফল্য কামনা করেছেন, আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা রইলো। এছাড়া শ্বশুড় পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই; বিশেষ করে আমার অর্ধাঙ্গ জনাব সাইদুর রহমান সানির প্রতি অশেষ ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা; কেননা আমার উচ্চতর গবেষণাকর্ম সম্পাদনে তাঁর উৎসাহ আমার প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ফলে আমি দ্বিগুণ উৎসাহে আমার এই এম. ফিল গবেষণার অভিসন্দর্ভটি চূড়ান্তরূপে সফলতায় রূপ দিতে সক্ষম হয়েছি। আমি আবারও মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি এবং এবং তাঁর প্রিয় বান্দা রাসুল (স.) এর প্রতি শ্রশদ্ধ সালাম জানিয়ে শেষ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মওলানা আব্দুর রহমান জামির জীবন ও কর্ম

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মওলানা আব্দুর রহমান জামির জীবন ও কর্ম

জন্ম ও বংশ পরিচয়

ইসলামি জাহানের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মওলানা আব্দুর রহমান জামি (র.)। ফারসি কাব্যাকাশে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি খাতেমুন শো'আরা (সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ কবি) হিসেবে সমাদৃত। ফারসি গদ্য সাহিত্যেও তাঁর অবদান অনন্য। আরবি ব্যাকরণে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কালজয়ী সাক্ষী শারহে জামি; যা এখনো সমগ্র বিশ্বে বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোতে উচ্চস্তরের ছাত্রদের জন্য পাঠ্য হিসেবে বিদ্যমান।

এই মহান মনীষী ইরানের এক ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি বংশে হিজরি ৮১৭ সনের ২৩ শাবান এশা'র নামাজের সময় জন্মগ্রহণ করেন। জামির পুরো নাম নূর আদ-দ্বীন আব্দুর রহমান ইবনে নিযাম উদ্দিন আহমদ ইবনে শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হানাফী জামি (মূর্তবা ও গিলানী: ১৯৮৭:১)। জামির ঘনিষ্ঠ শিষ্য রাখি আদ-দ্বীন আব্দুল গফুর লারী বলেন, জামির আসল উপাধি ইমাদ আদ-দ্বীন (ধর্মের স্তম্ভ) আর প্রসিদ্ধ উপাধি হচ্ছে নূর আদ-দ্বীন (ধর্মের জ্যোতি) বা নূরুদ্দিন। তাঁর মোবারক নাম আব্দুর রহমান (হিকমত, ১৯৮৪: ৯)। তাঁর পিতার নাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আদ দাশতি। দাশতি উপাধি স্থানগত এবং ইসফাহান[১] এর দাশত মহল্লার সুবাদে। তাঁর দাদা মওলানা মুহাম্মদ ছিলেন ইমাম মুহাম্মদ শায়বানির বংশধর। ইমাম শায়বানি ছিলেন ইমাম আবু হানিফা নোমান ইবনে সাবেত এর অন্যতম শিষ্য (মূর্তযা ও গিলানী, ১৯৮৭: ১)। শায়বান গোত্রের সুবাদে তিনি শায়বানি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তা ছিল একটি আরব গোত্র। এই গোত্রের পরবর্তী বংশ ধারায় বহু জ্ঞানী মনীষী জন্মলাভ করেন। ইমাম শায়বানি ১৮৯ হিজরিতে ওফাত প্রাপ্ত হন। তুর্কানদের হামলা ও লুটতরাজের হাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেজামির দাদা শামস আদ-দ্বীন মুহাম্মদ দাশতি ইসফাহানের পাশত মহল্লা হতে দেশত্যাগ করে ঘোরাসানে আসেন। তিনি জাম[২] অঞ্চলের 'খারজান'[৩] গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। জামির দাদা তোয়া ও বিচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দস্তখত ও কোনো লেখার বেলায় দাশতি উপনাম ব্যবহার করতেন। জাম

অঞ্চল ছেড়ে যাবার পরও তিনি লেখা বা দস্তখতের ক্ষেত্রে জামি উপনাম ব্যবহার করতেন (মূর্তযা ও গিলানী, ১৯৮৭: ২)।

মওলানা আব্দুর রহমান জামির জন্ম হয় জাম অঞ্চলের খারজাদ গ্রামে। জামির নামের জামি শব্দটি একাধারে স্থানীয় পরিচয়, আবার ঐতিহ্যগতও। তিনি তাঁর 'ফাতেহাতুশ শাবাব' কাব্য গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, যেহেতু এই অধমের জন্মস্থান জাম এবং প্রসিদ্ধ বুজুর্গ শায়খুল ইসলাম আহমদ জামির[৪] জীবন সাধনার কেন্দ্রবিন্দু ও সমাধিস্থল; জাম ও তাঁর পানপেয়ালা হতে আমার লিখুনি নিঃসৃত, সেহেতু আমি জামি কবি নামটি নিজের জন্য চয়ন করেছি। তিনি বলেন,

مولدم جام و رشحۀ قلمم
جرعۀ جام شیخ الاسلامی است
لاجرم در جریدۀ اشعار
بدو معنی تخلصم جامی است

আমার জন্মস্থান জাম আর আমার কলমের কালি
পির শায়খুল ইসলামির জামবাটির অঞ্জলি।
কাজেই এই দুই সূত্রে কবিতার ফলকে
আমার নাম অঙ্কিত জামি রূপে (হিকমত, ১৯৮৪: ৫৯)।

গবেষক ড. মুহাম্মদ মুঈন জামি (র.)-এর নাম পরিচয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা দিয়েছেন; যা এখানে প্রণিধানযোগ্য। নাম নূর উদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে নিজাম উদ্দিন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ তিনি বিখ্যাত ইরানি কবি ও সাহিত্যিক। তাঁর জন্ম ইরানের খোরাসানের জাম এলাকার খারগার্দে হিজরি ৮১৭ সালে, ওফাত হেরাতে ৮৯৮ হিজরিতে। তিনি তাঁর জন্মস্থান জাম এবং শায়খুল ইসলাম আহমদ (মৃত্যু ৫৩৬ হিজরি)-র প্রতি আধ্যাত্মিক সম্পর্কের সুবাদে জামি কবিনাম ধারণ করেন। পিতার সাথে তিনি হেরাত ও সামারকান্দ সফর করেন এবং সেখানে জ্ঞান সাধনায় রত হন। ধর্ম, সাহিত্য ও ইতিহাস শাস্ত্রে তিনি চরম ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করেন। এ পর্যায়ে সা'দ উদ্দিন মুহাম্মদ কাশগরি[৪] খাজা আলী সামারকান্দি ও কাজিজাদা রুমি[৫] এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও

আধ্যাত্মিকতা শুরুর স্তরে উন্নীত হন। তিনি নকশবন্দিয়া তরিকায় দীক্ষা লাভ করেন এবং ঐ তরিকার পির মুর্শিদ সা'দ উদ্দিন কাশগরির ইন্তেকাল হলে জামি ঐ তরিকার খিলাফত লাভ করেন। জ্ঞান-প্রতিভা ও আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষতায় চতুর্দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি রাজা বাদশাহ আমির-ওমরাগণের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হন। তিনি হজ উপলক্ষে দীর্ঘ সফর করেন এবং দামেস্ক ও তাবরিয হয়ে ৮৭৮ হিজরিতে হেরাতে প্রত্যাবর্তন করেন তাঁর সমকালীন বাদশাহ ছিলেন আবুল গাজি সুলতান হুসাইন বায়কারা[৬] ও তখনকার মন্ত্রী ছিলেন আমির আলী শির।[৭]

জীবন ও কর্ম

যে কোনো মহৎ ব্যক্তিকে জানার উৎকৃষ্ট মাধ্যম ঐ ব্যক্তির স্বরচিত জীবনি গ্রন্থ বা স্মৃতিকথা। মওলানা আবদুর রহমান জামির ক্ষেত্রে তাঁর স্বলিখিত বহু রচনার মধ্যে একটি হচ্ছে জামির দ্বিতীয় দিওয়ানে সন্নিবেশিত একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা। কবিতাটির শিরোনাম 'শারহে বা'ল বে শারহে হাল'। কবিতাটি তিনি ৮৯৩ হিজরি অর্থাৎ মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বে রচনা করেন। প্রায় ৮০ শ্লোকের এই কবিতায় তিনি আত্মজীবনীর ওপর ব্যাপক আলোকপাত করেন।

কবিতাটির প্রথমে তিনি নিজের জন্মতারিখ উল্লেখ করেন। এরপর কবিতাটি রচনার তারিখ উল্লেখ করেন। তৃতীয় পর্যায়ে তিনি যেসব জ্ঞানার্জন করেছেন, সেদিকে ইঙ্গিত করেন। তাতে তিনি আরবি ব্যাকরণ (নাহু সরফ), মানতিক (যুক্তিশাস্ত্র), হিকমতে মাশশায়ী (যুক্তিনির্ভর দর্শন) ও হিকমতে ইশরাকি (আলোকন দর্শন), হিকমতে তাবিয়ি (প্রকৃতি বিজ্ঞান), হিকমতে রিয়াযি (গণিত শাস্ত্র), ফিকাহ (আইন শাস্ত্র), উসুলে ফিকাহ (আইন শাস্ত্র মূলনীতি), হাদীস শাস্ত্র, কুরআনের কিরাআত বিজ্ঞান ও কুর'আনের তাফসির প্রভৃতি অধ্যয়নের কথা উল্লেখ করেন।

চতুর্থ পর্যায়ে, তিনি কিভাবে তাসাউফের সাধনা ও সুফিতত্ত্বেপ্রবেশ করেন তার বর্ণনা দেন। এ পর্যায়ে তিনি সাধনার বিভিন্ন স্তর কিভাবে অতিক্রম করেন তা একে একে উল্লেখ করেন। তারপরে কাব্যচর্চার বর্ণনা দেন। অর্থাৎ পঞ্চম পর্যায়ে তিনি কিভাবে কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন।

সর্বশেষ ষষ্ঠ পর্যায়ে একটি মোনাজাত সন্নিবেশিত আছে। তাতে সম্মানিত নবি রাসুলগণ (স.) মহানবির চার খলিফা, সাহাবায়ে কেরাম (রা), তাবেয়িন, তাবে তাবেয়িন (র.) এবং সত্য পথের অনুসারী ও আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তদের দোহাই দিয়ে মোনাজাত কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে আর্জি পেশ করেন (হিকমত, ১৯৮৪: ৬২)।

কথায় আছে, ওস্তাদ শাগরেদ এর ন্যায়। জামির ইন্তিকালের পর আমির তার জন্য শোকগাঁথা কাব্য রচনা করেন। এছাড়া জামির স্মরণে খামসাতুল মুতাহাইয়েরিন নামক জীবনচরিত রচনা করেন। এই মহান আমিরের জন্ম হেরাতে ৮৪৪ হিজরিতে আর ইন্তেকাল একই স্থানে ৯০৬ হিজরিতে।

তুর্কি ও ফারসি ভাষায় রচিত তার রচনাবলি বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'তারিখে হাবিবুস সিয়র' ও 'তাযকিরায়ে মাজালিসুন নাফায়েস' (ফারসি) গ্রন্থে তার জীবনচরিত আলোচিত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে গবেষক মাসিয়ু বিন রচিত মূল্যবান একটি প্রবন্ধ এশিয়াটিক জার্নালে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়েছে। জামি সম্পর্কে আমির আলী শির লিখিত 'খামসাতুল মুতাহাইয়েরীন' গ্রন্থটি তুর্কি জাগতায়ী ভাষায় রচিত এবং একটি ভূমিকা, তিনটি নিবন্ধ ও একটি উপসংহারে বিন্যস্ত। ইরানি গবেষক মুহাম্মদ আপা নাখজাওয়ানি গ্রন্থটি সরল ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন।

জামির (র.) শিক্ষা জীবন

আব্দুর রহমান জামির পিতা নিজাম উদ্দিন আহমদ জীবন-জীবিকার তাগিদে 'জাম' অঞ্চল ছেড়ে হেরাতে চলে আসেন। তখন থেকে জামি (র.) হেরাতের (বর্তমান আফগানিস্তান) নিজামিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন শুরু করেন। তখনকার দিনের প্রচলিত সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল তাঁর অধীত বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। জামির (র.) শিক্ষাজীবন সম্পর্কে জীবনী লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বিস্তৃত ও সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন আব্দুল গফুর লারী। জীবনীকাররা তাঁর বর্ণনাকেই নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিভিন্ন আঙ্গিকে উল্লেখ করেছেন। তার সারসংক্ষেপ আমরা এখানে উল্লেখ করছি। প্রথমত: সব জীবনীকার এ বিষয়ে একমত যে, জামি (র.) শৈশব থেকে প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর মুখস্থ রাখার শক্তি ছিল অসাধারণ (মুর্তজা ও গিলানী, ১৯৮৭:৫)।

জনাব লারী বলেন: হেরাতে অবস্থানকালে নিজামিয়া মাদরাসায় জামি (র.) সর্বপ্রথম মওলানা জুনাইদ উসুলির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি 'মুখতাসার তালখিস', 'শরহে মিফতাহ' ও 'মুতাওয়াল'' অধ্যয়ন করেন। বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও তিনি অসাধারণ প্রতিভার বলে অনায়াসে 'মুতাওয়াল' ও তার হাশিয়ার মত কঠিন কিতাব অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি সে যুগের অতিশয় দক্ষ শিক্ষাবিদ সৈয়দ শরীফ জুর্জানি রাহমাতুলাহ আলাইহি এর শিষ্য মওলানা খাজা আলী সামারকান্দির দারসে যোগদান করেন। তিনি যদিও বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ওস্তাদ ছিলেন, তথাপি জামি মাত্র চল্লিশ দিন অধ্যয়ন

করেই সেই ওস্তাদের কাছে অধ্যয়নের প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলেন। তারপরে প্রসিদ্ধ তার্কিক ও জ্ঞানতাপস সা'দ উদ্দিন তাফতাজানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহের শিষ্য-ধারার প্রসিদ্ধ আলেম মওলানা শাহাব উদ্দিন মুহাম্মদ জাজুমি এর দারসে যোগদান করেন (হিকমত, ১৯৮৪: ৬২-৬৩)।

উচ্চশিক্ষার্থে দেশ ভ্রমণ

হেরাতের নিজামিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন শেষে তিনি সামারকান্দে শীর্ষস্থানীয় সব ওস্তাদদের দারসে যোগদান করেন। প্রথমে তিনি হাজির হন যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ কাজিযাদা রুমি এর মজলিসে। প্রথম মজলিসেই উভয়ের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সেই আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়। এবং শেষ পর্যন্ত কাজি সাহেব তাঁর সাথে সব বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন (মুর্তজা ও গিলানী, ১৯৮৭:৫)।

ইতিহাসের নিরিখে সামারকান্দে মওলানা জামির অধ্যয়নকাল সম্বন্ধে কিছু চমকপ্রদ বর্ণনা পাওয়া যায় । তাঁর শিষ্য লারীর বর্ণনা; যা সকল জীবনীকার অতিশয় নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে-

মওলানা ফাতহুল্লাহ তারবিধী ছিলেন ঐ যুগের অন্যতম বিদ্যাসাগর। মির্জা উলাগ বেগের দরবারে তাঁর মর্যাদা ছিল সবার শীর্ষে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সামারকান্দে কাজিযাদা রুম এর মাদ্রাসায় তারই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তখনকার যুগের শীর্ষস্থানীয় সব পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ আলেম সেখানেছিলেন। কাজিজাদার সে মজলিসে অতিশয় প্রতিভাধর ব্যক্তিবর্গ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সেখানে কাজিযাদা মওলানা আব্দুর রহমান জামি সম্পর্কে মন্তব্য করেন: 'যতদিন থেকে সামারকান্দের গোড়াপত্তন হয়েছে ততদিন থেকে স্বভাবগত প্রতিভা ও ধীশক্তির বিচারে এই জামির মতো কেউ আমু নদীর পানি অতিক্রম করে নি (হিকমত, ১৯৮৪:৬২)।' কাজিজাদা রুম এর ছাত্র মওলানা আবু ইউসুফ সামারকান্দি মওলানা জামির (র.) বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে বলেন: তিনি যখন ক্লাসে যেতেন তখন অনেক সময় এমন ঘটত যে, জামি কোনো এক ছাত্রের একটি নোটবই হাতে নিয়ে কয়েক মূহুর্ত চোখ বুলিয়ে নিতেন। এরপর ক্লাসে উপস্থিত হয়ে দেখা যেত যে, পড়ালেখায় তিনি সবার চেয়ে সেরা (মুর্তজা ও গিলানী, ১৯৮৭:৭)।

মওলানা মুখিন তুসি শ্রেণিকক্ষে সকল বিষয়ে জামির (র.) অসাধারণ দখল সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে উপসংহার টেনে বলেন যে, কিছু ইলম যেহেতু প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী শ্রুতি নির্ভর এবং

পাঠশালায় গিয়ে হাসিল করতে হতো সেহেতু মওলানা জামি মাদরাসায় যেতেন, অন্যথায় সামারকান্দে তার কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল না। বরং তিনি নিজেই মাদ্রসার আলেমদের ওপর জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন।

একদিন তাঁর ওস্তাদদের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়। তিনি বলেন যে, আমি কোনো ওস্তাদের কাছেইএমন কোনো পাঠ গ্রহণ করিনি; যাতে আমার ওপর ওস্তাদের প্রাধান্য বলবৎ ছিল; বরং সব সময় জ্ঞান আলোচনায় আমি তাঁদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতাম। এ হিসেবে আমার ওপরে কোনো শিক্ষকেরই ওস্তাদি সাব্যস্তনয়; আমি প্রকৃতপক্ষে আমার পিতার ছাত্র, আমি ভাষা শিখেছি তাঁর কাছ থেকেই। প্রতীয়মান হয় যে, মওলানা জামি (র.) তাঁর পিতার কাছেই সরফ ও নাহু (আরবি ব্যাকরণ) অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর পরে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ও বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে কারো কাছে তিনি তেমন মুখাপেক্ষী ছিলেন না।

জামির (র.) আধ্যাত্মিকতা

ইতিহাসে স্মরণীয় বরণীয় ইরানি কবিদের চিন্তাধারার মূলে রয়েছে তাসাউফ বা অধ্যাত্মিক চিন্তা। আমরা জামির জীবনী অংশে তরিকতের সাধনা ও তাঁর পির মুর্শিদদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখানে তার অধ্যাত্মিক চিন্তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমরা ইসলামি তাসাউফ বা আধ্যাত্মিকতার মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ প্রেম। সেই প্রেমের সূত্র ধরে রাসুল প্রেম এবং সমাপ্তির মাঝে বিরাজমান প্রেমের ঐকতানে একাকার হওয়া বা বিশ্ব প্রেমে নিজেকে উজাড় করা। আল্লাহর সাথে প্রেমের জন্য প্রথম শর্ত আল্লাহর পরিচয়। এই পরিচয় কিভাবে অর্জন সম্ভব এবং আল্লাহর সাথে বান্দার আত্মার বন্ধনের স্বরূপ কি? জামি তাঁর অধ্যাত্ম চিন্তায় ইসলামি জাহানের দু'জন শ্রেষ্ঠ মনীষীর অনুসারী ছিলেন। একজন মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি। অপরজন মওলানা জালালুদ্দিন রুমি। তিনি মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির বিশ্ববিখ্যাত অত্যন্ত জটিল *কিতাব কুসুস হিকাম* এর ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁর নাম দিয়েছেন *নকপুন নুসু কি শরহিল ফুস*। জামির রচনাবলি অংশে আমরা এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছি। এছাড়া ইবনুল আরাবি ও তাঁর অনুসারী সাগরেদদের ব্যবহৃত বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পরিভাষায় তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে রচনা করেছেন *'লামাআত' এর শরাহ 'আশআ'*। এই ব্যাখ্যায় তিনি বারে বারে ইবনুল আরাবির বিভিন্ন উক্তির উদ্ধৃতি টেনেছেন। বস্তুত জামি বিশ্বাস করেন যে, ইশকে হাকিকি (সত্যিকার প্রেম) মানুষকে চিরন্তন সৌভাগ্যের অধিকারী করতে সক্ষম। প্রেমের বাদশাহই অস্তিত্ব জগতের প্রতিটি পরতে দৃশ্য অদৃশ্য সবকিছুতে রাজত্ব করে যাচ্ছেন। আশেক (প্রেমিক), মাশুক (প্রেমাস্পদ) ও ইশক (প্রেম) সবই

একটিমাত্র নিরঙ্কুশ অস্তিত্বে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। তফাৎ যা আছে তা প্রেমাস্পদের প্রকাশমানতা ও তাঁর শহুদি (প্রত্যক্ষণগত) তাজাল্লির তারতম্যের মধ্যেই। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের প্রত্যেকেই একে অপরের আয়না স্বরূপ। নিরঙ্কুশ প্রেম সকল বস্তু নিয়ে প্রকাশিত, সকল অনুভব ও সংবেদনশীলতায় প্রতিফলিত এবং সাধনারতদের কাছে তা উদ্ভাসিত। যেমন আকৃতিগত তাজাল্লি সকল সৃষ্টির আকৃতিতে নিপতিত, প্রেরণাগত তাজাল্লি- যা সকল জ্ঞান মনীষা প্রতিভা ও মেধার ওপর প্রতিবিম্বিত এবং জাতি (সত্তাগত) তাজাল্লি- যা সাধনার চূড়ান্তগত স্তরের লোকেরা লাভ করে থাকে।

অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ও সুফিতাত্ত্বিকদের মতোই মওলানা জামি বান্দার মধ্যে আল্লাহর উদ্ভাসকে দর্শনের মধ্যে দৃশ্যমান প্রতিচ্ছবির উদ্ভাসের সাথে তুলনা করে বুঝান। যেখানে হুলুল বা প্রবিষ্ঠ হওয়া কিংবা ইত্তেহাদ বা একত্বে পরিণত হওয়ার সংশয়ের অবকাশ নেই। পৌত্তলিকদের বোধ-বিশ্বাসের সামান্যতম সংশয়ও সেখানে নেই। তাঁর মতে আল্লাহর পথে সাধকদের পথযাত্রা সামগ্রিকভাবেই সাইর ইলাল্লাহ (আল্লাহর পথে যাত্রা)-এর মাধ্যমে শুরু হয় আর কয়েকটি স্তর পার হয়ে তা সাইর ফিল্লাহ (আল্লাহর মাঝে সফর) এর মাধ্যমে শেষ হয়। এই সফর সাধনা ও পথযাত্রার রয়েছে বিভিন্ন নূরানি ও ফালমানি (আঁধারীর) পর্দা। সফর, সায়র বা যাত্রা বলতে বুঝায় সেই নূরের বা আঁধারীর পর্দা অপসারিত হওয়া এতে দু'টি কৌস (ধনুক) আছে। একটি কৌস ওয়াজিব (অনিবার্য) অপর কৌসটি ইমকান (সম্ভবনা সংক্রান্ত)।
'কা'বা কাওসাইন অউ আদনা' এর মাকাম বলতে এই দুই কৌসকে বুঝানো হয় ।

জামির তাওহিদ দর্শনের অন্যতম মর্মার্থ হচ্ছে মুহিব্ব (প্রেমিক) এর কার্যাবলি মাহবুব (প্রেমাস্পদ) এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। আশেক এর যা কিছু আছে মাতক থেকেই তা লব্ধ। আকৃতি ও অবয়বের বিভিন্নতা ও আধিক্য প্রকৃত একক এর এককত্বে কোনো প্রভাব ফেলে না। এক হতে যত অধিক প্রতিবিম্বিত হোক, এক সেই একই থাকে। মাশুক (প্রেমাস্পদ)-এর বহুবিধ তাজাল্লি (ঝলক) রয়েছে আর আশেক (প্রেমিক) এর রয়েছে বিভিন্ন রূপী যোগ্যতা। সেই তাজাল্লির মাত্রা অনুপাতে প্রেমিকের (আত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। আর সায়র ফিল্লাহ- আল্লাহর মাঝে সফর এর যে রাস্তা তার শেষ সীমা নেই। প্রেমিকের সাধনা তার অন্বেষা ও তাড়না এবং তার উন্নতি চিরন্তনভাবে অব্যাহত থাকে। তা এমন যে, বলা হয়ে থাকে প্রেমিকের হৃদয় হলো তাআইয়ুন (নির্দিষ্টতা) হতে পবিত্র। পরম মর্যাদার তাঁবুগুলো সেখানেই খাটানো এবং অদৃশ্য ও দৃশ্য জগতের সাগর সঙ্গম সে হৃদয়েই সমাহিত। এমন হৃদয়ের সাহস মনোবল অসাধারণ। কবির ভাষায়:

اگر بساغر دریا هزار باده کشد هنوز همّت او ساغر دگر خواهد

সাগর যদি পান করে মদিরার হাজারো পেয়ালা

এখনো সে চায় আরো পেয়ালা আরো মদিরা।

সাধনার পদ্ধতিকে জামি (র.) এরূপ উপমা দিয়ে বুঝান; এক খণ্ড বরফ; যা আসলে পাস্তুরিত পানি, সেই বরফ দিয়ে তৈরি করা হলো কলসী। কলসিটা ভরা হলো পানি দিয়ে। সন্দেহ নেই যে, জমাটবদ্ধতা আর আকৃতি বিবেচনায় কলসিটি পানি থেকে আলাদা। কিন্তু একটু পরে সূর্যের তাপ এসে পড়ল। কলসি গলে যেতে লাগল। পরক্ষণে কলসীকে পানি আত্মস্থ করে ফেলল। অনুরূপ নিরঙ্কুশ হাকিকত যখন বিভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশিত হল, তখন বহুবিধ অবয়ব ধারণ করল। কিন্তু সৌভাগ্যবান অন্তরের ওপর হঠাৎ এককত্বের সূর্যের প্রখর তাপ পতিত হল। আকৃতিগুলোকে সন্মুখ থেকে তিরোহিত ও নিঃশেষ করে ফেলল। সবকিছুকে এককার করে দিল। তখন সাধক বলে ওঠল ঘরের মধ্যে ঘর ওয়ালা ছাড়া আর কেউ নেই। জামি মনে করেন যে, গুণাবলি দুই শ্রেণির। কতক ওজুদি (অস্তিত্বগত) আর কতক আদমি (অনস্তিত্বগত)। ওজুদি গুণাবলি মাশুক (প্রেমাস্পদ) এর সাথে সম্পৃক্ত আর আদমি বা অস্তিত্বহীনতা সম্পর্কিত গুণগুলো আশেক (প্রেমিক)-এর সঙ্গে যুক্ত। কাজেই গেনা বা অমূখাপ্রেক্ষিতা হলো মাশুকের গুণ আর দারিদ্র আশেক এর গুণ। দারিদ্র্য এর বিভিন্ন স্তর ও মর্যাদা রয়েছে। আশেককে উদ্দেশ্য ও কামনা থেকে মুক্ত হতে হবে। নিজস্ব অন্বেষা ও ইচ্ছা তার থাকতে পারবে না। শুধু মাশুক কি চায় সে দিকেই নিবিষ্ট থাকতে হবে। মাশুক এর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির মাঝে ফারাক করতে হবে। এখানে এসেই সাধক আশেক দৃশ্যমান ও আত্মিক সাধনা, বিভিন্ন আমল ও কার্যসম্পাদনের জন্য অদিষ্ট। আশেকের মাঝে যে ওজুদি অস্তিত্বগত গুণ তা মূলত মাশুক (প্রেমাস্পদের) এরই গুণ- যা আশেক এর কাছে আমানত হিসেবে রয়েছে। আশেক মাশুকে পৌঁছার ধাপগুলো তিনটি ভাগে বিন্যস্ত। তাহলে ইলমুল ইয়াতিন, আইনুল ইয়াধিন ও হাকুল ইয়াকিন। এটা বুঝবার উদাহরণ হলো, কেউ চোখ বন্ধ করে রাখল আর উত্তাপ অনুভব করে আগুনের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করল। তার সে জ্ঞান হবে ইলমুল ইয়াকিন। আর যখন চোখ দুলবে আর স্বচক্ষে আগুন দেখতে পাবে তখন যে জ্ঞান হবে তা হলো আইনুল ইয়াকিন। আর যখন আগুনে পতিত হয়ে ভস্মিভূত হয়ে যাবে আর তার মধ্য দিয়ে আগুনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে তখন তা হবে হক্কুল ইয়াকিন।

প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মাঝে প্রয়োজনের সম্বন্ধ বিদ্যমান। প্রেমিক যখন চূড়ান্ত পর্যায়ের এককত্বে ও নিঃসঙ্গতার স্তরে উপনীত হয় তখন সবকিছু থেকে, এমন কি মাতক হতেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন প্রেমের সত্তাগত এককত্ব সে লাভ করে। তখন আধিক্যের পোষাক অর্থাৎ প্রেমিকত্ব ও প্রেমাস্পদত্ব উভয় থেকে খসে পড়ে। প্রত্যক্ষকারী প্রত্যক্ষকৃত হয়ে যায়। আশেকের গুণাবলি পরিবর্তিত হয়ে বাকা বা'দাল ফানা (ফানার পর বাকা) এর গুণাবলি ধারণ করে আর সমাবিষ্ট হওয়ার পরে ফারাক হওয়ার মাকাম লাভ করে। তখনই কামালিয়াত ও এরশাদের মনজিলে পৌঁছে যায়। তখন নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে যে, সবই নিজে। আর বলে

انا من اهوی و من اهوی انا
جانا ز میان ما منی رفت و توئی
پون من تو شدم تو من مکن ذکر دوئی

আমি সে-ই, যাকে আমি খুঁজে ফিরি
আর যাকে চাই, সে তো আমিই।
প্রিয়তম। আমাদের মাঝ থেকে আমি ও তুমি তিরোহিত
আমি তুমি আর তুমি আমি দুইয়ের কথা বলো কেনো?" (ফাখুরি ও জার, ১৯৮৮:২৪৩)

মওলানা আব্দুর রহমান জামি (র.) তাঁর রচনাবলিতে তাঁর আধ্যাত্মিক মতাদর্শ সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, তার সারসংক্ষেপ আলোচনা করা হলো। জামি তাঁর সাধনার এই পথপরিক্রমার স্বপ্ন লালন করতেন সবসময় হৃদয়ে ও চিন্তায়। তাঁর এই অনুপম সুন্দর অধ্যাত্ম চিন্তাটি অতি সংক্ষেপে ও সাবলিলভাবে ফুটে ওঠেছে তাঁর একটি মোনাজাতে। লাওয়ায়েহ কিতাবের শুরুতে তিনি প্রাণের আকুতি মিশিয়ে ব্যক্ত করেছেন এই আর্তি। নিম্নে তাঁর আর্তির বাংলা অনুবাদ তুলে ধরছি,

"হে খোদা, ইয়া আল্লাহ! আমাদের মুক্তি দাও
নিষিদ্ধ বিষয় নিয়ে ব্যস্ততা হতে
আমাদের দেখাও প্রত্যেক জিনিষের হাকিকত, আসল রূপে।
অলসতার পর্দা সরিয়ে দাও আমাদের দিব্যদৃষ্টির সম্মুখ হতে

প্রত্যেক জিনিষ যেমনটি তার স্বরূপ-দেখিয়ে দাও আমাদেরকে।
অনস্তিত্বকে দেখিও না আমাদের, অস্তিত্ব রূপে
অস্তিত্বের সৌন্দর্যের গায়ে দিও না অনস্তিত্বের পর্দা টেনে।
এসব কাল্পনিক আকৃতিকে তোমার সৌন্দর্যের তাজাল্লির দর্পন বানাও
হিজাব, দূরত্ব ও বঞ্চনার কারণ বানিও না, অস্তিত্বের বস্তুনিষ্ঠকে।
কল্পনার এই যে রূপ, নানা নকশা আমাদের জ্ঞান-বর্ধক বানাও!
আমাদের অজ্ঞতা অন্ধত্বের নির্দেশক বানিও না এসবকে ।
যত বঞ্চনা বিরহ বিচ্ছেদ, সে আমাদের কারণেই ঘটেছে।
দয়া কর মুক্তি দাও আমাদেরকে আমাদের কাছ থেকে।
দাও পরিচয় তোমার আমাদেরকে।

তিনি আরো বলেছেন,

یارب دل پاک و جان آگاهم ده
آه شب و گریهٔ سحر گاهم ده
در راه خود و اول ز خودم بخود کن
آنگاه بیخود بسوی خود را هم ده

(ইয়া রব দিলে পাক ও জা'নে আগাহাম দে
আ'হে শাব্ ওয়া গিরয়ায়ে সাহারগাহাম দে।
দর রাহে খোদ আউওয়াল যে খোখেদম বিখোদ কুন
অ'নগাহ বিখোদ বেয়ে খোদ রাহাম দে)

অর্থ: প্রভুহে পুত: দিল দাও সচেতন প্রাণ আমাকে রাতের আহজারী শেষরাতের ক্রন্দন এই বান্দাকে। তোমার পথে প্রথমে আমার কাছ থেকে আত্মহারা কর আমাকে এরপর আত্মাহারাকে দেখাও যে পথ গেছে তোমার এই দিকে।"

জামির (র.) কবিতা, পদ্য রচনা ও উক্তিসমূহ পর্যালোচনা করলে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, জামি (র.) ছিলেন তার যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফি। তিনি নকশবন্দিয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন এবং

নকশবন্দিয়া তরিকার নিয়ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা দিতেন। তবে তখনকার অনেক সুফি বজুর্গের মত দরবার সাজিয়ে পির মুরিদের বাজার তিনি চালু করেন নি। জামি (র.) তার কাব্যগ্রন্থ হাফত আওরাঙ্গ' এর সর্বত্র বিশেষ করে সিলসিলাতুয জাহার' গ্রন্থে এ জাতীয় পিরদের দাগাবাজ, দোকানদার, গির্জাধর্মী সুফি ও ভক্ত বলে ভর্ৎসনা করেছেন (জামি, ১৯৮৪: ৫)।

জামির শিষ্য আবদুল গফুর লারি, তাসাওফ এর প্রতি জামির (র.) বিশ্বাস এবং তরিকতের শেখদের প্রতি তার অগাধ ভক্তি সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। লারীর মতে, জামি (র.) তাসাওফকে ইসলামের হাকিকত তথা প্রকৃত রূপ বলে মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন ধারা এই নিয়ম ও বিশ্বাসের ওপর পরিচালিত ছিল।

আবদুল গফুর লারী জামির (র.) জীবনের এ অধ্যায়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভাষার অলংকার ও কারুকার্য প্রয়োগ করে যে তথ্যটি দিয়েছেন সংক্ষেপে তা হলো : জামি (র.) উচ্চশিক্ষার জন্য হেরাত ত্যাগ করে সামারকান্দে[৯] গিয়েছিলেন। সেখানে জ্ঞান-গরিমা ও উচ্চতর ফজিলত, কামালিয়াত অর্জন করার পর এক রাতে- যে রাত ছিল ভোরের মত উজ্জ্বল, মনের কানে শুনতে পান যে, বুজুর্গ আরেফ হযরত সা'দ উদ্দিন কাশগরি (র.) যেন তাঁকে ডেকে বলছেন:

رو دادر یاری گیر که ناگزیر تو بود

'যাও ভাই! কোনো মুর্শিদ গ্রহণ কর, যে তোমাকে পথ দেখাবে।

এ ঘটনার পর তার অন্তরে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তিনি খোরাসান প্রত্যাবর্তন করেন। লারী আরো বলেন, মরহুম সা'দ উদ্দিন কাশগরি তাঁর বৈঠকখানার নিকটবর্তী জামে মসজিদে নিয়মিতভাবে দরবেশদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। হযরত জামির যাতায়াতের রাস্তা ছিল সেই দিক দিয়ে। তিনি যতবারই যেতেন মাখদুম (মাননীয়) সা'দ উদ্দিন (র.) ততবার বলতেন, এই লোকটার আশ্চর্যজনক যোগ্যতা আছে। আমি তাঁর উপর আসক্ত। জানি না কিভাবে তাকে কব্জায় আনব। প্রথম যেদিন তিনি মখদুম সা'দ উদ্দিনের খেদমতে উপস্থিত হন, সেদিন বলছিলেন,

شاهبازی بچنگ ما افتاده است

"এক বাজ পাখি আমাদের জালে আটকা পড়েছে।"(মুর্তজা ও গিলানী, ১৯৮৭: ১০)

জামি ছিলেন নকশবন্দিয়া তরিকার অনুসারী ও পরে খলিফা। এই তরিকার প্রবর্তক ছিলেন খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি। খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দির[১০] সাথে জামির সম্পর্ক ছিল তিনটি স্তরের সহায়তায়। একটি হলো সা'দ উদ্দিন কাশগরির আধ্যাত্মিক নিসবত ছিল মওলানা নিজাম উদ্দিন খামুশ এর সঙ্গে। তিনি আধ্যাত্মিক নিসবত নিয়েছিলেন খাজা আলাউদ্দিন (যিনি আল-আত্তার নামে খ্যাত) এর নিকট থেকে;খাজা আলাউদ্দিনেরনিসবত ছিল মহান শায়খ বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ বুখারী নকশবন্দীর সঙ্গে। রাশাহাত আইনুল কুযাত এর বর্ণনা অনুযায়ী মওলানা জামির মুর্শিদ সা'দ উদ্দিন কাশগরির ওফাত হয়েছিল হিজরি ৮৬০ সালের জমাদিয়ুস সানির ৭ তারিখ (হিকমত, ১৯৮৪: ৬৮)। কাশগরি জামির আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন।

আধ্যাত্মিকতাবিহীন সুফি দর্শন সম্পর্কে জামি (র.)

জামির দৃষ্টিতে কালাম শাস্ত্রবিদদের নীতিমালা ও তাসাউফপন্থীদের শিক্ষাদীক্ষার মোকাবিলায় দার্শনিকদের আকিদা বিশ্বাস ও ভ্রান্তিবিলাসের কোনো গুরুত্ব নেই। জামির ধারণা অনুযায়ী তারা শরিয়তের সিরাতুল মুস্তাকিম হতে বিচ্যুত এবং তরিকতপন্থীদের আত্মিক প্রেরণা ও 'হাল' হতে বঞ্চিত। হাকিকতের যে নূর তা অবশ্যই শরিয়তের সীমানার মধ্যে পেতে হবে। দর্শনের মারপ্যাঁচে তা অবান্তর। তিনি সন্তান জিয়াউদ্দিন ইউসুফকে কিছু নসিহত করেছেন এবং তা লাইলি মাজনুন কাব্যগ্রন্থের শেষভাগে বিধৃত রয়েছে। তাতে তিনি তার ছেলেকে দার্শনিকদের অনুসরণ হতে বারণ করেছেন আর ওলামায়ে দ্বীনের অনুকরণের জন্য উৎসাহিত করেছে...

چون فلسفیان دین بر انداز　　از فلسفه کار دین مکن ساز

দার্শনিকরা যেহেতু মূল্যোৎপাটনকারী　　দ্বীনের কাজকে তাই মাপবে না দর্শনের মানদণ্ডে।

پیش تو رموز آسمانی

افسون زمینیان چه خوانی؟

তোমার সম্মুখে মেলা বিশাল আকাশের রহস্যভাণ্ডার মাটিতে পতিতদের কল্পকাহিনী পড়ে লাভ কি তোমার?

یثرب اینجا، مشو چو دونان
اکسیر طلب ز خاک یونان

এখানে মদিনা আছে, তাই হীন লোকদের মতো খুঁজে
বেড়াবে না প্রাণ সঞ্জিবনী সুরা গ্রিসের কাছে।

ره نیست جز آنکه مصطفی رفت
تا مقصد صدق راست پا رفت

কোনো পথ নাই, মোস্তফার দেখানো সেই পথ ছাড়া পবিত্র সত্তার গন্তব্য পর্যন্ত এ পথ অবিচল সোজা।

میکن برهش نگاه و می رو
می بین پی او براه و می رو

তার পায়ের পরে নজর রাখ, যাও সম্মুখে এগিয়ে
দেখ তার পদাঙ্ক, চল সেই পথ বেয়ে বেয়ে।

زان ره که زپای او نشان نیست
برگرد، که جز هلاک جان نیست.

যেই পথে নাই তাঁর পদচিহ্ন, দেখ সাবধান!
ফিরে এসো, কারণ সে পথে ধ্বংস অনিবার্য (জামি, ১৯৮৭: ৯০৭-৯০৮)।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাসাউফের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভক্তিশ্রদ্ধা বলতে জামি প্রচলিত অর্থে তরিকত বা তাসাউফের রেওয়াজের অনুসরণ বুঝান নি। বরং তিনি আধ্যাত্মিকতার হাকিকতকে সামনে নিয়ে কথা বলতেন। অন্যথায় যারা পিরে কামেল মুকাম্মিল এর দাবিদার, খানকাহ বা আস্তানা সাজিয়ে মুরিদ শিকারের দোকানদার, তিনি তাদের তিরস্কার করেছেন বিভিন্ন কবিতায়। যদিও তিনি বায়আত করার জন্যে তার মুর্শিদের পক্ষ হতে এজাযত পেয়েছিলেন, তবুও কোনো দিন লোকদের

মুরিদ করান নি। একান্তপ্রয়োজন দেখা দিলে ডেকে কানে কানে উপদেশ দিতেন। পির মুরিদীর বাজার বসানোকে ঘৃণা করতেন। বাজারি পিরদের সম্পর্কে তার তিরস্কার মাখা উচ্চারণের একটি নমুনা-

حذر از صوفیان شهر و دیار

همه نامرم اند و مردم خوار

নগর পল্লীর এসব সুফিদের খপ্পড় হতে বাঁচাও

সবাই অমানুষ অথচ মানুষ থেকো ।

کارشان غیر خواب و خوردن نی

هیچشان فکر روز مردن نی

খাওয়া আর ঘুমান ছাড়া নাই কোনো কাজ

একদিন মরতে হবে সে চিন্তা করতে নারাজ।

ذکرشان صرف بهر سفره و آش

فکرشان حصر در وجوه معاش

তাদের জিকির নিয়োজিত ডেকচি ও দস্তরখানায়

তাদের চিন্তা নিবেদিত রুটি রুজির সাধনায়

هر یکی کرده منزلی دیگر

نام آن خانقاه یا لنگر

প্রত্যেকে সাজিয়েছে একেক মনজিল আস্তানা

আর নাম দিয়েছে খানকাহ কিংবা লঙ্গরখানা।

فرشهای لطیف افکنده

ظرفهای نکو پراکنده

দামী কার্পেট বিছানা পাতা আস্তানায়

সুন্দর ঝকঝকে বাসন কোসন পরিবেশনায়

چشم بر درگه کیست کرده و شهر

یافته از طریق مردان بهر

দরজার দিকে তাদের নজর কে আসে

শহর গ্রাম হতে হাদিয়ার নজরানা নিয়ে।

گوشت یا آرد آورد دو سی من
تا نشیند بصدر شیخ زمن

গোশত আসে, হালুয়া রুটির হাদীয়া আসে
দর্শনার্থী এসে বসেন জমানার ওলির পাশে।
سر انبان لاف بگشاید
بر حریفان گزاف پیماید

বড় বড় গালগল্প শুরু করেন হুজুর বাবা
অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের নানা বুলি গালভরা।
نکند بس ز مهمل و قلماش
تا بدان دم که بخته گردد آش.
বসে বসে প্রহর গুণে কবে নামবে ডেকচি
আধ্যাত্মিক সাধনার নামে এরা পেট পূজারি (জামি, ১৯৮৭: ১২৬-১২৭)।

পরিবারিক জীবন

হযরত মওলানা সা'দ উদ্দিন কাশগরি (কু.সি.)-এর দুই কন্যার মধ্যে একজনের সঙ্গে জামির (র.) বিয়ে হয়।সেই ঘরে চারটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। প্রথম সন্তানটির বয়সকাল ১ দিনের চেয়ে বেশী ছিল না এবং তার কোনো নাম রাখা হয়নি। তার দ্বিতীয় ছেলের নাম খাজা সফি উদ্দিন মুহাম্মদ। ১ বছর বয়সে সে মারা যায়। তার মৃত্যুতে মওলানা জামি অতিশয় শোকাভিভূত হন এবং তা শোকে একটি মরসিয়া রচনা করেন, যা তার প্রথম দিওয়ানে সন্নিবেশিত হয়েছে। তার তৃতীয় সন্তানের নাম খাজা জিয়াউদ্দিন ইউসুফ। তার জন্ম হয় হিজরি ৮৮২ সালের শাওয়াল মাসের ৯ তারিখে। জিয়াউদ্দিন ইউসুফ এর শৈশবকাল সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ ঘটনা আছে। একদিন হেরাতের পুরনো মসজিদের উত্তরে অবস্থিত হাউজের পাড়ে মওলানা জামি বসা ছিলেন। এ সময় জনৈক খাদেম জিয়াউদ্দিন ইউসুফকে কোলে করে বাইরে নিয়ে আসে। এ সময় ইউসুফ-এর বয়স ছিল আনুমানিক পাঁচ বছর। কাছে আসার পর বলল, বাবা আমি খাজা উবায়দুলাহকে দেখি নি। মওলানা জামি মুখের কোলে হেসে ওঠলেন এবং বললেন:

তুমি খাজাকে দেখেছ। তবে মনে করতে পারছ না। পরবর্তীতে তিনি বলেন যে, ঐ সময়কার এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ এস্থানে উপস্থিত হয়েছেন আর মসজিদের উত্তরে একটি বাতায়নের দিকে ইঙ্গিত করছেন। আমি জিয়াউদ্দিনকে হাতের ওপর নিয়ে তার কাছে আনলাম। যাতে তিনি এই কিশোরের প্রতি একটি দয়ার নজর দান করেন। তাকে যেন দু'আ দানে ধন্য করেন। হযরত খাজা তাকে আমার হাত হতে টেনে নিলেন এবং তার মুখ মোবারক তার মুখের মধ্যে রাখলেন। আর ধবধবে সাদা কি একটা জিনিস তার মুখ থেকে তার মুখের মধ্যে ফেলে দিলেন, তাতে তার মুখ ভরে গেল। আর কিছু অংশ বেরিয়ে আসল। এরপর তিনি তাকে আমার হাতে দিলেন। আমি তখন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। জামি (র.)-এ স্বপ্নের ঘটনা ঘেরাপনামায়ে ইস্কান্দারী কাব্যগ্রন্থে খাজা ওবায়দুল্লারপ্রশংসা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন (হিকমত, ১৯৮৪:৭৮-৭৯)।

তার চতুর্থ ছেলের নাম খাজা জহিরউদ্দিন ঈসা। খাজা জিয়া উদ্দিন ইউসুফের জন্মের ৯ বছর পর তার জন্ম হয়। জন্ম তারিখ হিজরি ৮৯১ সালের ৫ মহররম বৃহস্পতিবার। তিনি আনুমানিক চল্লিশ দিনের মাথায় ইন্তেকাল করেন (হিকমত, ১৯৮৪:৭৮-৭৭)।

জামির একজন ভাই ছিলেন, নাম মওলানা মুহাম্মদ, মাজালিসুন নাফায়েস কিতাবে তার জীবনী বিধৃত হয়েছে। তিনি বড় জ্ঞানী ও পণ্ডিত ছিলেন। বিশেষ করে ইতিহাস ও সংগীত বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি বেশ কিছু রুবাই লিখেছেন। এই ভাইয়ের ইন্তিকালে জামি একটি শোকগাঁথা গজল রচনা করেন। গজলের একটি শ্লোক এরূপ :

من بودم از جهان و گرامی برادری
در سلک نظم جمع گرانمایه گوهری

আমি ছিলাম আর এই জগতে ছিল সন্মানিত এক ভাই
কবিতার গাঁথুনীতে তার নাম ছিল রত্ন সমতুল্য। (হিকমত, ১৯৮৪: ৮০)

ভ্রমণলব্ধ জ্ঞানার্জন

মহা মনীষীদের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও পরিপক্কতা অর্জনের জন্য তারা অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে দেশ বিদেশ সফর করা। কুর'আন মাজিদেও এজন্য দেশ ভ্রমনের তাগিদ দেয়া হয়েছে। ইমাম গাজজালি, শেখ সাদি, ইবনে বতুতা প্রমুখের জীবনধারা ও দেশ ভ্রমণের সাহায্যে তাদের পরিপক্কতার শীর্ষে পৌঁছার ইতিহাস অতি সমৃদ্ধ। মওলানা জামির জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়।

মূলত: দাদার দেশত্যাগের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাঁরজীবনের এই সাধনা। শৈশব থেকে তাঁর জীবনে বেশ কয়েকটি দেশ ভ্রমণের ঘটনা পাওয়া যায়। সেগুলো হচ্ছে-

শৈশবে পিতার সঙ্গে জাম হতে হেরাত গমন এবং খাজা আলী সামারকান্দির কাছে অধ্যয়ন করেন। তরুণ বয়সে শাহরুখের শাসনামলে হেরাত[১১] হতে সামারকান্দ গমন। সামারকান্দ হতে হেরাত প্রত্যাবর্তন, আলাউদ্দিন আলী কুশচি-এর কাছে অধ্যয়ন এবং মওলানা সা'দ উদ্দিন কাশগরির শিষ্যত্ব গ্রহণ। খাজা উবায়দুল্লাহ আবার এর সাক্ষাত লাভের জন্য হেরাত হতে মার্ভ গমন।[১২] খাজা উবায়দুলাহ আহবারের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ৮৭০ হিজরি সালে দ্বিতীয়বার সামারকান্দের তাশকন্দের[১৩] ফারাবে উপরিউক্ত খাজার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তৃতীয়বার সামারকান্দ সফর, ৮৮৪ হিজরি সালে ৮৭৭ সালে খোরাসান হতে হেজাজ সফর। তখন হামাদান[১৪] কুর্দিস্তান, বাগদাদ, কারবালা ও নজফ[১৫] হয়ে মদিনা ও মক্কায় গমন। তারপর দামেস্ক, হালাব (আলেপ্পো) ও তাবরীয়[১৬] হয়ে খোরাসানে প্রত্যাবর্তন (হিকমত, ১৯৮৪:৮২)।

সর্বশেষ হজের সফর

সর্বশেষ সফরটি মওলানা জামির দীর্ঘতম ও ঘটনাবহুল সফর। তিনি হিজরি ৮৭৭ সালের রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে এ সফরে রওনা হন। এ সময় খোরাসানের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে পায়ে হেঁটে এমন সফর হতে বিরত হবার জন্য অনুনয় বিনয় করেন। জবাবে তিনি স্বভাব-মূলত ভাষায় বলেন যে, পায়ে হেঁটে বহুবার হজ করে ক্লান্ত অবসন্ন হয়েছি। এবারে বাহনে করে হজ্বে যেতে চাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হেঁটেই হজে যান।

হেরাত হতে যাত্রা আরম্ভ করে তিনি নিশাপুর[১৭] সবযাওয়ার[১৮] বাস্তাম[১৯] দামেগান[২০] সেমনান[২১] কাজবিন[২২] ও হামাদান হয়ে গমন করেন। হামাদানের গভর্ণর মনুচেহের পরম ভক্তি ও ভালবাসায় অন্তত তিনদিন তার কাফেলার মেহমানদারী করেন এবং রাজকীয় সম্মানে আপ্যায়িত করেন চাকর-বাকরসহ তার খেদমত আঞ্জাম দেন। তিনি তার হজ কাফেলা নিরাপদে কুর্দিস্তান অতিক্রম করার ব্যবস্থা করেন ও বাগনান সীমানায় পৌঁছিয়ে দেন। তিনি জমাদিউল আউয়ালমাসের আগের মাসের ১২ তারিখে বাগনান উপনীত হন। কয়েকদিন অবস্থানের পর আমীরুল মুমেনিন হুসাইন (র.)-এর মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে কারবালা গমন করেন। এরপর আবার তিনি বাগনান গমন করেন।

বাগদানে পৌঁছার পর তিনি রাজ্যেশাসীদের রোষানলের শিকার হন। এর কারণ ছিল তার কাফেলার কয়েকজন সু'জন লোক পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করে একজন কাফেলা ত্যাগ করে বাগনাদের রাফেজিদের (শিক্ষা) দলে যোগ দেয় আর মওলানা জামির কিতাব "সিলসিলাতুজজাহার' এর কয়েকটি কবিতার বেইত আলাদা করে তার সাথে কিছু বাক্য জুড়ে নিয়ে রাজ্যেশাসীদেরকে কাফেলার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। শেষ পর্যন্ত বাগদানের শাসকবর্গ এবং হানাফি ও শাফেয়ি বিচারকগনের উপস্থিতিতে এক বিরাট মাহফিলে কিতাবের প্রকৃত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলে, লোকেরা মওলানা জামির (র.) পাণ্ডিত্য ও উদারতা সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং প্রতিবাদকারীরাজামির (র.) মুখে হযরত আলী (র)-এর প্রশংসা শুনে লজ্জায় অবনত হয়। মওলানা জামি (র.) পরবর্তীতে বাগদানের বিব্রতকর পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে একটি কবিতা রচনা করেন। বাগদানে তাঁর অবস্থানকাল ছিল চার মাস। রমজান মাসের ঈদের পরে তিনি হেজাজ-এর উদ্দেশ্যে রওনা হন। শাওয়াল মাসের শেষভাগে তিনি নাজাফে হযরত আলী (র.)-এর পবিত্র মাজার জিয়ারত করেন এবং তাঁর শানে কবিতা রচনা করেন। মাজারের মুতাওয়াল্লি তথা সায়্যেদুস সাদাত ছিলেন সৈয়দ শরফ উদ্দিন মুহাম্মদ লাইস নকিব। তিনি তাঁর খান্দানের সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে পরম ভক্তি শ্রদ্ধা জানিয়ে অতি সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে মওলানা জামির মেহমানদারী করেন।

জিলকদ মাস আগমন করলে তিনি তাঁর কাফেলা নিয়ে মরু বিয়াবানের পথে রওনা হন এবং মদিনায়ে মুনাওয়ারার অভিমুখে যাত্রা করেন, যাবার পথে তিনি নবিজির (স.) শানে কবিতা রচনা করেন। ২২ দিন সফর শেষে তিনি মদিনায় পৌঁছেন এবং রওজায়ে আকলাসে যথাযোগ্য সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় জিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর তিনি মক্কা মুয়াজজামার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১০ দিন পর জিলহজ মাসের প্রথম দিকে তিনি সেখানে পৌঁছান। হেরেম শরীফে তাঁর অবস্থানকাল ছিল ১৫ দিন। সেখানে পবিত্র হজ ও আনুষাঙ্গিক কতর্ব্যকর্ম সম্পাদনের পর পুনরায় তিনি মদিনা মুনাওয়ারার পথে রওনা হন। মদিনা মুনাওয়ারায় রওয়া মোবারকের জিয়ারতকালে তিনি একটি গজল রচনা করেন, যার প্রথম কলি

بکعبه رفتم و زانجا هوای کوی تو کردم

جمال کعبه تماشا بیاد روی تو کردم

কা'বায় গিয়েছিলাম সেখানে আপনার গলিতে আসবার তাওফিক চেয়েছি

কা'বার সৌন্দর্য দর্শনে মনে ভেসে উঠেছে আপনার চেহারার ছবি।

রওজায়ে আকদাস জিয়ারতের পর তিনি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং দামেস্কে ১৫ দিন অবস্থান করেন। সেখানে তিনি কাজি মুহাম্মদ হাফসারি-যিনি ছিলেন কাজিফুল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) সে যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, হাদীসের সনদে যিনি অত্যন্ত উঁচু স্তরে ছিলেন, তার সাহচর্য গ্রহণ করেন। তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনেন ও হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন। সেখানে অবস্থানকালে কাজি সাহেব তার যথাযোগ্য মেহমানদারি করেন।

এরপর তিনি হালাব (আলেপ্পো)-এর পথে রওনা হন। হালাব পৌঁছার পর সেখানকার সৈয়দগণ, ইমামগণ ও কাজিগণ তাঁর খেদমতে প্রচুর হাদিয়া তোহফা অর্পণ করেন। ঠিক ঐ সময়ে কায়সারে রুম (পূর্ব রুম নামে খ্যাত তুরস্ক অঞ্চলের) ওসমানি সম্রাট সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ সংবাদ পেয়েছিলেন যে, তিনি (জামি) খোরাসান হয়ে হেজাজ এর পথে রওনা হয়েছেন। সুলতান তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সভাসদকে খাজা আতাউল্লাহ কেরমানির নেতৃত্বে নগদ ৫ হাজার আশরাফি এবং ভবিষ্যতে আরো এক লাখ আশরাফির ওয়াদাসহ মওলানা জামির (র.) খেদমতে প্রেরণ করেন এবং অতিশয় অনুনয় বিনয় করে রোম সাম্রাজ্যে (তুরস্কে) তাশরিফ নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। মধুর ঘটনাটি হল, মওলানা জামি (র.) সুলতানের প্রেরিত প্রতিনিধি দল পৌঁছার কয়েক দিন আগেই ইলহাম যোগে অবগত হয়ে দামেস্ক হতে হালাব চলে আসেন। এদিকে প্রতিনিধিদল দামেস্ক পৌঁছার পর সেখানে মওলানা জামিকে (র.) না দেখে খুবই অনুতাপ অনুশোচনা করে। জামি (র.) হালাবে থাকতেই সুলতানের প্রতিনিধিদল দামেস্কে পৌঁছার সংবাদ পেয়ে যান। কাল বিলম্ব না করে তিনি হালাব হতে তাবরিয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। যাতে সুলতানের প্রতিনিধিদল হালাব না আসে এবং তাঁকে অনুরোধ-উপরোধ করে তুরস্ক যেতে বাধ্য না করে।

তাবরিয ভ্রমণ

মওলানা জামির (র.) সিদ্ধান্ত ছিল তিনি মক্কা ও মদিনা হতে সরাসরি হেরাত ফিরে যাবেন। কিন্তু আজারবাইজান-এর শাসক আমির হাসান বেগ আগ কুয়ুনলু "-এর বিশেষ অনুরোধ রক্ষার্থে তিনি তাবরিয গমন করেন। প্রায় এক মাস তাবরিযে অবস্থান করেন। তাবরিযে আগমন ও অবস্থানকালে সেখানকার বাসিন্দাদের প্রচুর সম্মান শ্রদ্ধা ও ভক্তি তিনি লাভ করেন। জামি তাবরিয সফর স্মরণে একটি গযল রচনা করনে (হিকমত, ১৯৮৪: ১)।

সেখানে অবস্থানের জন্য শত অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও তিনি বয়োবৃদ্ধ মায়ের সেবাযত্নের কথা বলে ঘোরাসানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। হিজরি ৮৭৮ সালের ১৩ শাবান তিনি হেরাতে উপনীত হন। এ সময় সেখানকার শাসক মির্জা সুলতান হুসাইন মার্ভে ছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহচরকে প্রচুর রাজকীয় উপঢৌকন ও ভক্তি শ্রদ্ধা মিশ্রিত একখানা চিঠিসহ জামির খেদমতে পাঠিয়ে দেন। চিঠিখানার উপরিভাগে এই শ্লোকটি লেখা ছিল:

اهلا بمقدمك الشريف فانه

فرح القلوب و نزهة الارواح

আহলান বিমাকদামিকাশ শরীফে ফা ইন্নাহু।

ফারহুল কুলুবে ওয়া নুজহাতুল আরওয়াহি

স্বাগতম আপনার মোবারক আগমনকে। কারণ তা

অন্তরসমূহের আনন্দ ও হৃদয়সমূহের জন্যে ফল্গুধারা (হিকমত, ১৯৮৪: ৮৬)।

ইন্তেকাল

মওলানা আব্দুর রহমান জামি হিজরি ৮৯৮ সালে ১৮ মহররম মাসে ইন্তেকাল করেন। এ হিসেবে তার জীবনকাল ছিল ৮১ বছর। (বর্তমান আফগানিস্তানের) হেরাতে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং জ্ঞানী মনীষী ও রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্বদের অংশগ্রহণে তাঁর নামাজে জানাজা ও দাফন অনুষ্ঠিত হয় ।

মওলানা জামির মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্বন্ধে মওলানার শিষ্য আব্দুল গফুর লারী একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনাটির সারসংক্ষেপ এরূপ:

দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময়টি ঘনিয়ে আসলে মওলানা জামি এমন সব উক্তি করতেন যেগুলো ইঙ্গিত করত যে, তিনি বুঝি কোন দূর সফরে বিদায় নিয়ে যাবেন। অসুস্থ হয়ে পড়ার কিছুদিন আগে তিনি বাসস্থান ছেড়ে শহরের উপকণ্ঠে তাঁর নিজস্ব একটি পল্লীতে বেড়াতে যান। সেখানে তিনি স্বাভাবিক নিয়মের চাইতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। ফলে সহচর ও বন্ধুরা ব্যথিত হয়ে ফিরে আসার জন্য অনুনয় বিনয় করেন, জবাবে তিনি বলেন :

دل از دیگر می باید کند

'পরস্পর হতে অন্তর বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে।

পরে বাসগৃহে ফিরে আসার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। যেদিন থেকে রোগ দেখা দিল তার ষষ্ঠ দিনে ১৮ মহররম জুমাবার ভোরে তার শিরার স্পন্দন মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছিল। এক সময় হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন 'হাম চুনিন' তা-ই হোক। মনে হল কেউ তাকে কোনো খবর দিয়েছে আর তিনি তাতে সম্মতি দিয়েছেন। তখনই তিনি নামাজের ইহরাম বাঁধলেন। দুইহাত বুকের ওপর উঠালেন আর সব সময় যে নিয়মে উচ্চস্বরে বলতেন সে নিয়মেওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি বলে দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। এ সময় সুস্থতা অসুস্থতার প্রতি তার আদৌ খেয়াল ছিল না। প্রথম রাকাতে সুরা কাফেরুন আর দ্বিতীয় রাকাতে কুল হুয়াল্লাহ পড়লেন। কোনোরূপ বিচলিত ভাব তাঁর মধ্যে দেখা গেল না ঠিক জুমার আজানের সময় তাঁর রূহ মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যায়।

শনিবার সকালে তখনকার সুলতান বাহাদুর খান অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও ক্রন্দনরত অবস্থায় তাকে দেখতে আসেন। শাহজাদা, আমির ওমরা ও শীর্ষস্থানীয় লোকেরা পরম শ্রদ্ধায় কাঁধে তাঁর কফিন বহন করেন এবং তাকে তাঁর পির মুর্শিদ সা'দ উদ্দিন কাশগরির কবরের পাশে সমাধিস্থ করা হয় (হিকমত, ১৯৮৪: ৬০)।

সমাধি

বর্তমান আফগানিস্তানের হেরাত শহরে মওলানা আব্দুর রহমান জামির মাজার অবস্থিত। এর অবস্থান হেরাতের প্রাচীন নগরীর উত্তরে খানিকটা পশ্চিমে এবং হেরাতের বর্তমান শহরের উত্তর পশ্চিমে আনুমানিক দুই কিলোমিটার ব্যবধানে। তাঁর মাজারের উত্তর পশ্চিমে শায়খ জাইনুদ্দিন খাফির মাজার। এর আনুমানিক পনেরশ' ফুট উঁচুতে উত্তরের পাহাড়টির ওপর সৈয়দ আবূ আব্দুল্লাহ মুখতারের মাজার অবস্থিত। আলী আসগর হিকমতের মতে- খেয়াবান' নামে খ্যাত ঐ এলাকাটিতে অসংখ্য বজুর্গের মাজার অবস্থিত এবং অনেকগুলোর নাম নিশানাও মুছে গেছে। মাওলানা জামির মাজারটি একটি বাগানসহ চারিদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। যেখানে কয়েকজন বুজুর্গ ও হেরাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কবর

অবস্থিত। দেয়াল ঘেরা মাজার এলাকার পশ্চিম পার্শ্বে মসজিদ আকৃতির একটি পুরোনো দালান রয়েছে। মাজার এলাকায় অন্য যেসব বুজুর্গের মাজার আছে তাদের মধ্যে একজন হলেন মাওলানা জামির পির মুর্শিদ মাওলানা সা'দ উদ্দিন কাশগরি। মাওলানা জামির ওফাতের আগেই এটি একটি সুরমা দরগাহ ছিল (হারাবী, ১৯৩১: ৩৪)। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইরানে শিয়া মাজহাবের উত্থানের সময় শাহ ইসমাঈল সাফাভি(শাসনকাল ১৫০২-১৫২৪ খ্রিস্টাব্দ) উক্ত এলাকার ওপর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালান এবং উভয় মাজার গুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন (হিকমত, ১৯৮৪: ৬০)। দীর্ঘদিন বিরান অবস্থায় থাকার পর আহমদ শাহ বাবা এর যুগে হেরাতের অধিবাসীগণ মাজারটি পুনঃনির্মাণ করেন। আমির হাবিবুল্লাহ খান শহিদের আমলে তাঁর নির্দেশে হেরাতের বিচার বিভাগীয় প্রধানের তত্ত্বাবধানে মাজারটি বর্তমান অবস্থায় পুনঃনির্মাণ করা হয়।

পরবর্তীকালে আফগানিস্তানের বিভিন্ন শাসকবর্গের তত্ত্বাবধানে এর সংস্কার ও উন্নয়ন সাধিত হয়। মাওলানা সা'দুদ্দিন কাশগরির পা বরাবর রয়েছে মাওলানা আব্দুল্লাহ হাতেফির কবর। অন্যদিকে মাওলানা জামির পা বরাবর রয়েছে মাওলানা আব্দুল গফুর লারীর কবর। তিনি মাওলানা জামির একান্ত শিষ্য। মাওলানা জামির ভাই মাওলানা মুহাম্মদের কবরও হচ্ছে মাওলানা জামির কবরের সামনা-সামনি। তিনি মাওলানা জামির আগে ইন্তেকাল করেন (মাওলানা জামির কবর বরাবর উপরে দেয়ালে একটি ফলক রয়েছে, যা রুস্তম আলী খান কর্তৃক ১৩০৪ হিজরি সালে স্থাপন করা হয়। ফলকটিতে আরবির মিশ্রনে গদ্য ও পদ্যে নিম্নোক্ত কথাগুলো লেখা রয়েছে:

هو الباقی -کل من علیهافان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام .قد اجاب دعوة الحق و اتی بقلب سلیم .به فحوای یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة .طاوس روح مقدس عنقای قاف لاهوت، و شهباز پرواز اوج جبروت، مهبط انوار قدم، کاشف اسرار علوم و حکم، مسند نشین کعبهٔ عالی مقام، بلبل خوش آهنگ نهارستان بلند نامی، عارف نامی و قطب گرامی، مولانا نور الحق و الملة و الدین عبد الرحمان الجامی قدس الله تعالی سره السامی از مضیق دامگاه غرور بوسعت سرای سرور پرواز نمود.

অর্থ: এই আহবানের প্রেক্ষিতে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং বিশুদ্ধ সমর্পিত আত্মা নিয়ে এসেছেন, যিনি পবিত্র রূহের জগতের ময়ুর, লাহুত জগতের বিহঙ্গমা, আলমে জাবারূত এর শিখর আরোহী শাহীন, প্রাচীনতম আলোকমালার অবতরণস্থল, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার রহস্য উন্মোচনকারী, সুউচ্চ

আসনের কা'বায় যার আসন, সুনাম সুখ্যাতির গুলবাগের সুকণ্ঠি বুলবুল, সুপ্রসিদ্ধ আরেফ ও অতি সম্মানীয় কুতুব, সত্য, জাতি ও দ্বীনের আলো মাওলানা আব্দুর রহমান জামি (আল্লাহ তাআলা তাঁর সুমহান আত্মাকে পবিত্রতায় সুবাসিত করুন।) তিনি অহংকারের পশুশালার সংকীর্ণতা হতে আনন্দময় উর্ধ্বলোকের বিশালতায় উড়াল দিয়েছেন।

সমাধি গাত্রে আরো রয়েছে,

جامی که بود مایل جنت مقیم گشت
فی روضة مخلدة ارضها السماء
کلک قضا نوشت روان بر در نهشت
تاریخه و من دخله کان آمنا

بسعی اهتمام رستم علیخان این لوح نصب شد از زایرین امید دعای خیر می دارد.

তিনিই একমাত্র চিরন্তন।
এ জগতের সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে।
শুধু থাকবে আপনার প্রভুর পরম সত্তা।
যিনি মহিমান্বিত, মহাসম্মানিত।

রুস্তম আলী খানের উদ্যোগে এই ফলক স্থাপিত হলো। জিয়ারতকারীদের কাছে দোয়ার প্রত্যাশা রইল। ১৩০৪ সাল (হিকমত, ১৯৮৪: ২২১-২২৩)।

মাওলানা জামির (র.) সমসাময়িক মনীষীগণ

মওলানা জামির কালটি ছিল ইরানের শিক্ষা-সভ্যতা, কাব্য-সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার যুগ। তাঁর সময়ে বহু মনীষী ইরানের কাব্য ও সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এদের অনেকের সাথে জামির সম্পর্ক ছিল গভীর। অনেকের সাথে তাঁর ওঠাবসা ছিল। অনেকের প্রতি তিনি পরম ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ

করতেন। এখানে এ ধরনের পাঁচ জনের নাম উল্লেখ করা হলো। তাতে জামির আধ্যাত্মিকতা কতদূর গভীরে ছিল তার একটি ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।

খাজা মুহাম্মদ পারসা

আমরা জেনেছি যে, মওলানা জামির পির মুর্শিদ ছিলেন মওলানা সা'দ উদ্দিন কাশগরি। তিনি ছাড়া আর যেসব বুজুর্গের সান্নিধ্যে তিনি আলোকিত হয়েছেন তন্মধ্যে প্রথম ছিলেন খাজা মুহাম্মদ পারসা। খাজা মুহাম্মদ পারসা পবিত্র হজ্বে গমন উপলক্ষে বেলায়তে জাম (জাম অঞ্চল) দিয়ে যাচ্ছিলেন। অনুমান করা যায় যে, সে সময়টি ছিল হিজরি ৮২২ সালের জামাদিউল আউয়াল বা জামাদিউস সানির শেষ ভাগ। নাফাহাতুল উন্‌স কিতাবে মওলানা জামির বর্ণনা অনুযায়ী-

پدر این فقیر با جمع کثیر از نیاز مندان و مخلصان بقصد زیارت ایشان بیرون آمده بودند و هنوز عمر من پنج سال تمام نشده بود.....در زمرۀ محبان و مخلصان ایشان محشور شوم بمنه و جوده.

'এই অধমের (জামির) পিতা বিপুল সংখ্যক ভক্ত, অনুরক্ত ও নিয়াযমন্দ (দোয়া-ভিখারী)-সহ তাঁকে দেখার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলেন। তখনও আমার বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হয়নি। তখন আমার পিতা তার ঘনিষ্ট এক লোককে বললেন, যেন আমাকে কাঁধের ওপর তুলে ধরেন। এই ভিড়ের মাঝে যখন আমাকে তার হাওদার সামনে তুলে ধরা হলো তখন তিনি (খাজা মুহাম্মদ পারসা) একটি কেরমানি মিষ্টিদানা আমাকে প্রদান করেন। সে ঘটনার পর হতে এখন ৬০ বছর গত হয়ে গেল। এখনো তার আলোকোজ্জ্বল উদয়ের স্বচ্ছতা আমার চোখে ভাসছে আর তার মোবারক দিদারের (দর্শনের) আস্বাদ আমার অন্তরে অনুভব করছি। নিশ্চিতভাবেই খাজেগান কুদ্দাসা সিররাহু তাআলার খান্দানের প্রতি এই অধমের ভক্তি বিশ্বাস ও মুহব্বতের যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত তা তার সেই নজরে করমের বদৌলতেই হয়েছে। আমি আশা করি যে, এই সম্পর্কের বরকতে কাল কেয়ামতের দিন তার একনিষ্ঠ ভক্ত অনুরক্তদের সঙ্গে আমার হাশর হবে।

ফখরুদ্দিন পুরিস্তানি

মওলানা জামির সমসাময়িক আরেকজন মনীষী ছিলেন মওলানা ফখরুদ্দিন পুরিস্তানি (রহ.)। তিনি তার জামানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শায়খ ছিলেন। জামি বলেন, অধমের মাতাপিতার মালিকানাধীন একটি ঘরে যা জাম এলাকার খারজানে অবস্থিত ছিল, সেখানে একবার মওলানা ফখরুদ্দিন পুরিস্তানি (রহ.) আগমন

করেন। আমি তখন এতই ছোট্ট ছিলাম যে, আমাকে তার জানুর সামনে বসানো হয়। তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলের ইশারায় 'ওমর' 'আলী' এর মতো প্রসিদ্ধ মোবারক নামগুলো বাতাসের গায়ে লিখছিলেন আর আমি তা পড়ছিলাম। তাতে তিনি মুচকি হাসছিলেন আর বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন। তার সেই আদর ও দয়া আমার অন্তরে এই সুফি সম্প্রদায়ের ভক্তি ও ভালোবাসা গেঁথে দেয়। সেদিন থেকে এই ভক্তি ও ভালবাসা দিন দিন বর্ধিত হয়ে চলেছে। আমি আশা করছি যে, এই ভালবাসা নিয়ে বাঁচব। এই ভালবাসা নিয়ে মরব এবং তার বন্ধুদের মাঝে শামিল হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হব।

বুরহান উদ্দিন আবু নসর পারসা

খাজা বুরহান উদ্দিন আবু নসর পারসা-এর সঙ্গে মওলানা জামির (র.) খুব বেশী ওঠাবসা ছিল। জামি (র.) বলেন : একদিন বুরহান উদ্দিন আবু নসর পারসা-এর মজলিসে শেখ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবি[২৩] ও তার রচনাবলির ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি তাঁর পিতা মহোদয়ের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন 'ফুস (ফুসুসুল হিকাম)' প্রাণ আর 'ফুতূহাতে মক্কিয়া' হৃদয় তিনি একথাও বলেন যে, যে ব্যক্তি 'ফুস' ভালভাবে জানবে, তার মধ্যে হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের স্বভাব মজবুত হবে (হিকমত, ১৯৮৪: ৭০)।

২৩ মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি; পুরো নাম মুহিউদ্দিন আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আলী হাতেমী তায়ী মালেকী আন্দালুসী। তিনি ইসলামি জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফী তাত্ত্বিক। জন্ম ৫৬০ এবং মৃত্যু ৬৩৮ হিজরি। তিনি ওয়াহদাতুল ওজুদ (একক অস্তিত্ববাদ) এর জোরালো প্রবক্তা। ৫৬৮ হিজরিতে তিনি আন্দালুসিয়ার কেন্দ্রীয় নগরী এশবিলিয়া বংযনরষরুধ গমন করেন। সেখানে ৩৩ বছর কাল অবস্থান করেন এবং হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর তিউনেসিয়া সফর করেন। সেখান থেকে প্রাচ্যের দেশগুলো ভ্রমণ করেন এবং দুইবার মক্কায় ও দুইবার বাগদাদ আর এশিয়া সফর করেন। সর্বত্র তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত ও সমাদৃত হন। অবশেষে দামেষে স্থায়ী হন ও সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার গুর"ত্বপূর্ণ রচনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উলেখযোগ্য হল ফুতূহাতুল মাক্কিয়া, ফুসসুল হিকাম, তাজুর রোসায়িল ও কিতাবুল আযামাত।

শেখ বাহাউদ্দিন উমর

যাদের সান্নিধ্য মওলানা জামির (র.) বেশি লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ বাহাউদ্দিন উমর। জামি (র.) বলেন: শেখের ঘন ঘন অতিমাত্রায় তন্ময়তা হত। তিনি তীক্ষ্নভাবে বাতাস নিরীক্ষণ করতেন। কারণ, অশরীরী সৃষ্টি ফেরেশতাদের বাস যেহেতু বাতাসে সেহেতু তিনি ফেরেশতাদের দেখতেন। জামি (র.) আরো বলেন, একদিন হযরত শেখ-এর খেদমতে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে শহর হতে গ্রামে গমন করেছিলাম। শহর হতে আরো একদল লোক এসেছিল। তাঁর নিয়ম ছিল শহর হতে কেউ আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন যে, কি খবর? সে নিয়মে তিনি প্রত্যেকের কাছে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, শহর থেকে কি খবর নিয়ে এসেছেন? প্রত্যেকে কিছু একটা বলছিল। শেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কাছে কি খবর আছে? আমি বললাম, আমার কাছে কোনো খবর নেই। বললেন যে, আসার পথে কি কি দেখলে? বললাম, কিছুই দেখি নি। তখন তিনি বললেন: যে কেউ কোনো ফকিরের কাছে যায়, তার এমনভাবে যাওয়াই উচিত যে, তার কাছে শহরের কোনো খবর থাকবে না। পথেও অন্য কিছুর দিকে লক্ষ্য করবে না হিকমত, ১৯৮৪: ৭০)।

মওলানা জামি (র.) তাঁর সমসাময়িক আরো কয়েকজনের সাথে উপরোক্ত ধরনের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন নাফাহাতুল উনস্ কিতাবে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন খাজা শামসউদ্দিন মুহাম্মদ কুসূয়ি, মওলানা শামসউদ্দিন আসান, মওলানা জালালুউদ্দিন আবু ইয়াজিদ পুরানি, মওলানা শরফ উদ্দিন আলী ইয়াযদি।

খাজা শামস

পুরো নাম খাজা শামসুদ্দিন মুহাম্মদ কুসূয়ি; বর্ণিত আছে, খাজা কুসূয়ি যখন ওয়াজ করতেন, তখন তার ওয়াজের মজলিসে তখনকার বিশিষ্ট গুণিজন মওলানা সা'দ উদ্দিন, মওলানা শামসুদ্দিন মুহাম্মদ আসাদ ও মওলানা জালাল উদ্দিন আবু ইয়াজিদ পুরানি প্রমুখ হাজির হতেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা ও সুক্ষ্মতত্ত্বগুলো হৃদয়ঙ্গম ও সপ্রশংস দৃষ্টিতে গ্রহণ করতেন। এও বর্ণিত আছে যে, মওলানা জামি (র.)যেদিন খাজা কুসুয়ি এর মজলিসে উপস্থিত হতেন সেদিন খাজা বলতেন যে, আজকে আমাদের

মজলিসে একটি দ্বীপশিখা জ্বালানো হয়েছে। ঐ মজলিসে বেশি বেশিজ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা ও সূক্ষ্মতত্ত্ব ব্যক্ত করতেন। মওলানা জামি (র.) বলতেন যে, খাজা কুসূয়ি (র.) শেখ মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির রচনাবলির প্রতি ভক্তি বিশ্বাস রাখতেন এবং তাওহিদ এর প্রসঙ্গটি ইবনুল আরাবির দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে ব্যাখ্যা করতেন। তিনি এসব বিষয় মসজিদের মিম্বরে ওলামায়ে কেরামের মজলিসে এমনভাবে ব্যক্ত করতেন যে, কেউ তা অস্বীকার করতে পারত না। তিনি মানুষকে তার অন্তরের প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী চিনতে পারতেন। অর্থাৎ কে মানুষ কিংবা কার স্বরূপ জন্তু-জানোয়ারের মত তিনি তা বুঝতে পারতেন; তবে প্রকাশ করতেন না।

জালাল উদ্দিন আবু ইয়াযীদ পুরানী

তখনকার দিনের অন্যতম আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন মওলানা জালাল উদ্দিন পুরানি। মওলানা জামি (র.) পুরান গ্রামে জালাল উদ্দিন পুরানির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ঘন ঘন যাতায়াত করতেন। তার আধ্যাত্মিক তন্ময়তা সম্পর্কে মওলানা জামি বলেন যে, একবার আমি তার পাশে নামাজ পড়ছিলাম। দেখলাম যে, তিনি এতবেশি আত্মাহারা ও তন্ময় হয়ে গিয়েছেন, মনে হচ্ছিল তার কোনো সাধারণ জ্ঞান নেই। কখনো তিনি নামাজে হাত বাঁধা অবস্থায় একবার বাম হাতের ওপর ডান হাত আরেকবার ডান হাতের ওপর বাম হাত রাখছিলেন (জামি, ১৯৮৭:৪৫)। তবে মওলানা জামি (র.) যে পিরের সাথে জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত ভক্তি মহব্বত রাখতেন তিনি ছিলেন খাজা নাসির উদ্দিন উবায়দুল্লাহ প্রকাশ খাজায়ে আহরার।[২৩] তিনি ছিলেন নকশবন্দিয়া তরিকার পির-মুর্শিদ। জামি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কামালিয়াতের কথা সর্বত্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন (হিকমত, ১৯৮৪:৭২)।

সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ

মওলানা আবদুর রহমান জামি (র)-এর জীবনকাল অতিবাহিত হয় হিজরি নবম শতকের শেষভাগে (হিজরি ৮১৭-৮৯৮) বর্তমান আফগানিস্তানের হেরাতে। হেরাত তখনকার দিনে বৃহত্তর খোরাসান এর অন্তর্গত ও ইরানের পূর্বাংশ হিসেবে গণ্য হত। তখনকার ইরান দুইভাগে বিভক্ত এবং দু'টি রাজবংশের অধীনে শাসিত হত। ইরানের পূর্বভাগ শাসন করত তৈমূরী সুলতানরা। তাদের রাজধানী ছিল সামারকান্দ ও হেরাত। জামি ছিলেন এই রাজবংশের সমসাময়িক। তিনি উক্ত রাজবংশের যেসব সুলতানের শাসনকাল লাভ করেন তারা ছিলেন যথাক্রমে সুলতান শাহরুখ (৮১৭-৮৫০ হিজরি)-এর শাসনকালের অংশবিশেষ, মির্জা আবুল কাসেম বাবর (৮৫৬-৮৬১ হিজরি)-এর সালতানাত এর পুরো

আমল। মির্জা আবু সায়ীদ গুরকান (৮৬১-৮৭৩ হিজরি)-এর আমল এবং সুলতান হুসাইন বায়কারা (৮৭৫-৮৯৯ হিজরি)-এর আমলের বেশিরভাগ সময়। ইরানের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে শাসন চালাত প্রথমে কারা কুমুনদ্ তুর্কমানরা আর পরে আগ কুঘুনন্তুর্কমারা। উভয় রাজবংশের রাজধানী ছিল শিরাজ। মওলানা জামির জীবনকালে এই দুই রাজবংশের সমসাময়িক শাসকরা ছিলেন জাহানশাহ কারাকুয়ুন (৮৪১-৮৭৩ হিজরি) হাসান বেগ বা আয়ুন হাসান আগ কুয়ুন (৮৭১-৮৮৩ হিজরি)। গবেষক আলী আসগর হিকমত মওলানা জামির সমসাময়িক রাজনৈতিক উত্থান পতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, হিজরি নবম শতকের ইরানের রাজনৈতিক ঘটাবলির ইতিহাস হচ্ছে দীর্ঘকালীন শান্তি ও নিরাপত্তা আর স্বল্পকালীন গোলযোগ ও অস্থিরতা জামি, ১৯৮৭: ৫)।

গোলযোগ ও অস্থিরতার সময় একজন সুলতানের মৃত্যুর পর তখনকার অন্যান্য সুলতানগণ ও শাহজাদাগণের মাঝে রক্তক্ষয়ী লড়াই লেগে যেত। যেমন শাহরুখের মৃত্যুর পর (৮৫০-৮৫৬ হিজরি) ও আবুল কাসেম বাবরের মৃত্যুর পর (৮৫৬-৮৬১ হিজরি) এবং সুলতান আবু সায়ীদ এর মৃত্যুর পর (৮৭৩ ৮৭৫ হিজরি) ইরানের সর্বত্র চরম গোলযোগ, লুটতরাজ ও যুদ্ধবিগ্রহের দৌরাত্ম চলছিল। জামি এই তিনটি যুগের অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছিলেন। সৌভাগ্যবশত হিজরি ৮৭৫ সাল হতে অর্থাৎ যখন থেকে পূর্ব ইরানে সুলতান হুসাইন বায়কারার রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকে মওলানা জামির জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত খোরাসান ও মা ওয়ারাউন নাহার বা ট্রান্স অক্সিয়ানা অঞ্চলে পূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বলবৎ ছিল। এই দীর্ঘ ২৫ বছরেই মওলানা জামির সর্বোত্তম গদ্য ও পদ্য রচনাবলি লিপিবদ্ধ হয়। অনুরূপভাবে এই ২৫ বছর সময়কালে ইরানের বাকি অর্ধেকাংশে উঠুন হাসান ও তার ছেলে ইয়াকূবের শাসনামলে ইরাক, আজারবাইজান, ফার্স ও মেসোপটেমিয়ার মত ইরানের অঙ্গ রাজ্যগুলোতে পূর্ণ শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা বলবৎ ছিল। আমরা এখন তৈমূর বংশীয় সুলতানদের আমল ও তাদের সাথে জামির সম্পর্কের বিষয়টি মূল্যায়নের চেষ্টা করব।

সুলতান শাহরুখ

তৈমূর বংশীয় ইরানের শক্তিধর শাসক ছিলেন সুলতান শাহরূখ (৮১৭-৮৫০ হিজরি)। তার আমলটি যদিও জামির সমসাময়িক ছিল; কিন্তু তখন ছিল জামির কৈশোর ও যৌবনকাল। জামির এ সময়টি সামারকান্দে লেখাপড়া ও পরবর্তীতে আত্মিক সাধনায় অতিবাহিত হয়। এজন্য রাজ দরবারে তার যাতায়ত প্রমাণিত হয় না বা রাজকবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে তাকে গণ্য করা হয় নি। সম্ভবত এই

কারণেই জামির রচনাবলিতে কোথাও সুলতান শাহরুখ এর কোনরূপ উল্লেখ দেখা যায় না। উল্লেখ্য যে, হাবিবুস সিয়র প্রণেতা জামির সাহিত্যচর্চার অধ্যায়টির সারসংক্ষেপ এভাবে বর্ণনা করেছেন।

মির্জা আবুল কাসেম বাবর এর যুগে তার নামে উৎসর্গ করে জামি একটি পুস্তক রচনা করেন- যা সাহিত্যে ধাঁধা বা (ফান্নে মুয়াম্মা) সম্পর্কিত। সুলতান সাঈদ (মির্জা আবু সাঈদ)-এর জামানায় শুরুতে তিনি তার প্রথম দিওয়ান, তারপর তাসাউফ সম্পর্কিত কতিপয় রেসালা লেখেন। আর তার যাবতীয় রচনাবলি লিপিবদ্ধ করেন খাজা মনসূর (হুসাইন ইবনে বায়কারা)-এর সময়ে। এখন আমরা বিষয়টি একটু আলাদাভাবে আলোচনা করব।

মির্জা আবুল কাসেম বাবর

তৈমুরি শাসকবর্গের মধ্যে যে কয়জনের যত্নে ও পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সাধনার কীর্তি গড়ে উঠেছিল তন্মধ্যে দু'জন বাবরের নাম উল্লেখযোগ্য। একজন মির্জা আবুল কাসেম বাবর আরেকজন জহিরউদ্দিন বাবর। তিনি মির্জা আবু সাঈদ এর নাতি। তিনিই ভারতবর্ষে মোগল শাসনের গোড়াপত্তন করেন। যেহেতু জামির সাথে এই বাদশাহর সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিল না, সেহেতু তাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব না। যে বাবরকে নিয়ে জামির সাহিত্যচর্চার সূচনা তিনি হলেন সুলতান শাহরুখ এর ছেলে বায়সানকারা এর ছেলে মির্জা আবুল কাসেম বাবর। তাঁর ইন্তেকাল দিবস ২৫ রবিউস সানি ৮৬১ হিজরি। তিনি দানার পক্ষ হতে ১০ বছর কাল উত্তরাবাদ ও খোরাসানে এবং এরপর স্বাধীনভাবে গোটা আফগানিস্তান, খোরাসান, ফার্স ও ইরাকে (বর্তমান ইরাকের পূর্বাঞ্চলে) রাজত্ব পরিচালনা করেন। আমির আলী শির মাজালিসুন নাফায়েস কিভাবে এই বাদশাহর দরবেশী চারিত্রের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, বাদশাহ তাসাউফ সম্পর্কিত কিতাব লামাআত ও গুলশানে রাজ এর প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিলেন। জামির রচনাবলিতে সাহিত্যে ধাঁধাঁ-র মূলনীতি ও নিয়মকানুন সম্পর্কিত একটি কিতাব আছে। কিতাবটি ৮৫৬ সালে রচিত এবং তা মির্জা আবুল কাসেম এর নামে উৎসর্গিত। তিনি তার গজল কাব্যেও এই সুলতানের প্রশংসা করেছেন (আসগর, ১৯৮৪: ১৭-১৯)।

মির্জা আবু সাঈদ গুরকান

শাখরুখের পরে মির্জা আবু সাঈদ গুরকান মা ওয়ারাউন নাহার অর্থাৎ ট্রান্স অক্সিয়ানা অঞ্চলের শাসক হন। তিনি সবসময় খোরাসান দখল করার স্বপ্ন দেখতেন। কাজেই মির্জা আবুল কাসেম বাবর এর ইন্তেকালের পর তিনি ট্রান্স অক্সিয়ানা হতে খোরাসান এর ওপর হামলা পরিচালনা করেন এবং ৮৬৩

হিজরিতে হেরাত বিজয় করে এক বিশাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ৮৭৩ সালে বাদশাহ উন হাসান এর নির্দেশে আজারবাইজানে তাকে হত্যা করা হয়। তিনি ১২ বছরব্যাপী ট্রান্স অক্সিয়ানা, আফগানিস্তান ও খোরাসানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করেন। মওলানা জামি এই বাদশাহর নামে তার কোনো গ্রন্থ উৎসর্গ করেন নি। তবে তার মসনবি কাব্যে সুলতানের নামের সপ্রশংস উল্লেখ আছে আর দীওয়ানে গায়ালিয়াত কাব্যে সুলতান আবু সাঈদ এর নামে স্বতন্ত্র একটি গযল রয়েছে। সুলতান যখন নিহত হন তখন জমীর বয়স ছিল ৫৬ বছর।

সুলতান হুসাইন বায়কারা

তিনি হেরাত-কেন্দ্রিক বৃহত্তর খোরাসানে তৈমূর বংশীয় সর্বশেষ শক্তিধর সুলতান ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে পূর্ণ প্রতিপত্তি নিয়ে পূর্ব ইরানে শাসনকার্য পরিচালনা করেন । তার রাজত্বের ছায়াতলে খোরাসানে চাষাবাদের ব্যাপক উন্নতি হয়। দেশের সর্বত্র উৎপাদন, উন্নয়ন ও সুখ সমৃদ্ধির জোয়ার বয়ে যায়। জ্ঞানী গুণিরা বিপুলভাবে রাজদরবারে সমাদৃত হন। সুলতান সুফি দরবেশ, আলেম ও জ্ঞানীদের সাথে ওঠাবসা করেন। ব্যাপকভাবে মসজিদ, মাদ্রাসা ও সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করেন। নিজেও সাহিত্য ও কাব্যচর্চা করতেন বিধায় রাজদরবারে কবি সাহিত্যিকদের কদর ছিল ঈর্ষণীয়। এরূপ উদারচিত্ত সুলতানের দরবারে জামির প্রভাব ছিল অতুলনীয়। এ দরবারে জামির কদর ছিল অতুলনীয়।

আমির আলী শির

আমির আলী শির নাওয়ায়ি ছিলেন সুলতান হুসাইন বায়কারার প্রধানমন্ত্রী। তিনি নিজে জ্ঞানী ছিলেন, কবি ছিলেন। সেই সাথে জ্ঞানী মনীষী ও কবি সাহিত্যিকদের প্রতি উদারচিত্তে যত্নশীল ছিলেন। প্রচুর অর্থবিত্ত ও জ্ঞান গরিমার অধিকারী আলী শির এর সাথে জামির সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের। কিন্তু আলী শির নিজেকে মনে করতেন জামির শিষ্য এবং জামি তার ওস্তাদ। এই সম্পর্কের সুফল ছিল জামি তার বহু রচনা লিখেছেন আলী শির এর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায়। আর এসব রচনার সর্বত্র আলী শিরের নাম ও প্রসঙ্গ বন্ধুত্বের ও মর্যাদার নিরিখে উল্লেখ করেছেন। জামি তার বহু চিঠিপত্র, মসনবি, কবিতা, গজল, কাসিদা ও কেতআ রচনা করেছেন আলী শিরকে সম্বোধন করে অথবা আলী শির এর জবাবে। ৮৯৮ সালে জামির ইন্তেকাল হলে আমির আলী শির তার শোকে সুদীর্ঘ মরসিয়া রচনা করেন। এরপর জামির জীবনচরিত নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন 'থামসাতুল মুতাহাইয়েরীন' শিরোনামে। আমির আলী শির প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদায় থাকলেও তিনি রাজকীয় ক্ষমতা সবিনয়ে পরিহার করে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানীদের

পরিচর্যায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। আমির আলী শির তুর্কি জাগতায়ি ভাষায় অতুলনীয় প্রতিভাধর কবি ছিলেন। কবিতা, সাহিত্য, জীবন চরিতসহ অন্যান্য বিষয়ে তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৩টি।

পূর্ব ইরানের রাজ দরবারে জামির (র.) ভূমিকা ও মর্যাদা

তৈমূর বংশীয় সুলতানের দরবারে জামির নৈকট্য এমন পর্যায়ের ছিল যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্ত্রীবর্গ, আমিরগণ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের কাজেকর্মে ও প্রয়োজন পূরণে জামিকে উসিলা ও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতেন। তিনিও নিজের দরবেশী (সংসার বৈরি) জীবন সত্ত্বেও লোকদের প্রয়োজন পূরণে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তারা সুলতানের ক্রোধের শিকার হলে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। তিনিও তাদের জন্য সুপারিশ করার উদ্যোগ নিতেন। "হাবিবুস সিয়র"" নামক কিতাবের ৩য় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে যে, মজদুদ্দিন মুহাম্মদ খাফি যখন সুলতানের ক্রোধের শিকার হন তখন আত্মগোপন করেন এবং সুলতানের ভয়ে ও নিজের জানমাল হারানোর আশংকায় আত্মগোপন অবস্থা হতে বের হন নি। শেষ পর্যন্ত মওলানা জামি (রহ)-কে সুপারিশকারী ও উসিলা (মাধ্যম) হিসেবে গ্রহণ করে তিনি পূণর্বহাল হন (আসগর, ১৯৮৪: ২৫)।

মূলতঃ জামি ছিলেন হেরাত-কেন্দ্রিক তৈমূর বংশ শাসিত রাজ্যের শায়খুল ইসলাম। তৈমূরী রাজা বাদশা ও আমির ওমরাগণের কাছে জামির কতখানি মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল তার প্রমাণ মিলে একটি অভিব্যক্তি হতে। মওলানা জামি (র) হজ্বের সফর থেকে ফেরার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আমির আলী শির নওয়ায়ি (৮৪৪-৯০৬ হিজরি) রচিত নিম্নোক্ত রুবাঈটি এই অতুলনীয় অভিব্যক্তির সাক্ষ্য বহন করে,

انصاف بده ای فلک مینا فام
تا ز این دو کدام خوبتر کرد خرام
خورشید جهانتان تو از جانب صبح
یا ماه جهانگرد من از جانب شام

ইনসাফ করে বল হে নিলীম আকাশ তুমি!
এ দুইয়ের মধ্যে কোনটির শুভাগমন উত্তম অধিক?
তোমার জগৎ উদ্ভাসিত সূর্যের উদয়, চীনের দিক থেকে
নাকি আমার বিশ্বচারী চন্দ্রের উদ্ভাস সিরিয়ার দিক হতে? (নওয়ায়ী, ১৯৮৪: ১৮)

জামির রাজকীয় মর্যাদার আরেকটি দৃষ্টান্ত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বর্ণিত আছে, সুলতান হুসাইন বায়কারা হেরাতের মাদ্রাসা মাঠে এক আজিমুশ্বান মজলিসের আয়োজন করেন। তাতে মাদ্রাসার চার পাশে মেহমানদের জন্য তাঁদের মর্যাদা অনুসারে যথোপযুক্ত স্থান ও আসন তৈরি করা হয়। মাহফিলের মঞ্চে সুলতান এবং শাহজাদা ও মন্ত্রীদের জন্য আসন রাখা হয়। দুইপাশে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার লোকদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। সুলতানের যে প্রধান আসন তার এক পাশে ছিল জামির আসন আর অপরপাশে প্রধানমন্ত্রী আমির আলী শির এর বসার স্থান। হঠাৎ জামি মজলিসে উপস্থিত হন; কিন্তু শরীরিক দুর্বলতার কারণে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হল না। তিনি মাদ্রাসার নিচু ভূমিতে শান শওকতবিহীন একটি জায়গা পছন্দ করে মাটিতে বসে পড়েন। এর ফলে মজলিসের সকল রাজকীয় আয়োজন ভণ্ডুল হয়ে যায়। সুলতান এসে নিচে আসন গ্রহণ করেন আর আমির ওমরাগণ তার চারপাশে এসে বসেন (হিকমত, ১৯৮৪: ১৫৮)।

ইরানের বাইরের শাসকগোষ্ঠির সাথে জামির সম্পর্ক

বৃহত্তর খোরাসানের তৈমূর রাজংশের রাজাদের সাথে যেমন মওলানা জামির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল পশ্চিম ও দক্ষিণ ইরানের ক্ষমতাসীন তুর্কমান রাজাদের সাথেও তার মধুর সুসম্পর্ক ছিল। আলী আসগর হিকমত বৃহত্তর খোরাসানের শাসকবর্গের সাথে মওলানা জামির গভীর সম্পর্কের বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন করার পর তাদের প্রতিদ্বন্দ্বি পশ্চিম ইরানের তুর্কমান শাসকদের সাথে তার সুসম্পর্কের বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন জামির রচনাবলি ও কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে। এ পর্যায়ে তিনি তুর্কমান শাসক জাহানশাহ কারাকুয়ুন লু (৮৪১-৮৭২ হিজরি) উযূন হাসান আগ কুনলু (৮৭১-৮৮৩ হিজরি) এবং তার ছেলে সুলতান ইয়াকুব বেগ (৮৮৪-৮৯৬ হিজরি) এর প্রসঙ্গ নিয়ে জামির রচিত কবিতা ও কয়েকজন জীবনীকারের বর্ণনার উদ্ধৃতি এনে বলেছেন যে, এ সকল বাদশাহর সঙ্গে জামির সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত ছিল এবং তাদের প্রত্যেকে মওলানা জামির প্রতি যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান পোষণ করতেন তা ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হয়েছে এবং জামির রচনাবলি ও কবিতায় তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় (হিকমত, ১৯৮৪: ৩৪)।

জামির সফর সম্পর্কিত বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, জামি হেজাজ সফর হতে ফেরার পথে তাবরিযে সেখানকার শাসক হাসান বেগ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরবর্তীতে তার ছেলে ইয়াকুব বেগ এর

আমলেও খোরাসানের এই ওস্তাদ আর আজারবাইজান এর রাজধানীর মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

ওসমানী সম্রাটদের সঙ্গে জামির (র.) সম্পর্ক

মওলানা জামির খ্যাতির যখন জয়জয়কার তখন তুরস্ক কেন্দ্রিক দু'জন ওসমানী সম্রাট গোটা এশিয়া মাইনর ও বলকান অঞ্চলে প্রবল প্রতিপত্তি নিয়ে রাজ্যশাসন করছিলেন। জামির রচনার মধ্যে এই দু'জন বিখ্যাত ওসমানী সুলতানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তারা হচ্ছেন :

১. দ্বিগ্‌বিজয়ী হিসেবে খ্যাত সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতেহ (৮৫৫-৮৮৬ হিজরি) এবং
২. সুলতান বায়েজিদ খান দ্বিতীয় (৮৮৬-৯১৮ হিজরি)[২৪]

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা ও জীবনীকারদের নানা উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে, মওলানা জামির জীবদ্দশাতেই তার গুণগরিমার খ্যাতি পূর্ব ইরাক থেকে নিয়ে ইসলামি সভ্যতার শেষ সীমানা ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবাধীন সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে জামি শীর্ষক গ্রন্থের প্রণেতা উল্লেখ করেছেন যে, ফরিদূন বেগ-এর রচনাবলিতে (প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা-৩৬১, ইসলামবুল (ইস্তাম্বুল) মুদ্রণ) সুলতান বায়েজিদ দ্বিতীয় এর দু'টি পত্র ও মওলানা জামির পক্ষ হতে দু'টি জবাবী পত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে। উল্লেখিত দু'টি পত্র হতে জামির প্রতি সুলতান যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ পোষণ করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উভয় পত্রের সঙ্গে সুলতান ৫০০ ফোরিন[২৫] মওলানা জামির খেদমতে প্রেরণ করেন (হিকমত, ১৯৮৪: ৪৪)। আলী আসগর হিকমত উল্লেখিত দু'টি পত্র ও তার জবাব হুবহু তার গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন (হিকমত, ১৯৮৪: ৪৪-৪৭)।

হিকমত ওসমানী সম্রাটদের সঙ্গে জামির সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর আলোকপাত করেছেন । রাশাহাত আইনুল হায়াত গ্রন্থের রচয়িতা আলী ইবনে হুসাইন কাশেফির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন যে, জামি (র) জীবনে শেষবারের হজের সফর শেষে দেশে ফিরছিলেন। এরইমধ্যে ওসমানী সুলতানের দরবারে সংবাদ পৌঁছে যে, খোরাসানের ওস্তাদ হযরত জামি হেজাজ সফরে রওনা হয়েছেন। সুলতান তার একান্ত সভাসদদের একটি প্রতিনিধিদলকে প্রেরণ করেন হজ হতে প্রত্যাবর্তনকালে জামির সাথে সাক্ষাত করবার জন্য। খাজা আতাউল্লাহ কেরমানির নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে পাঁচ হাজার স্বর্ণের আশরাফি পাঠান। আরো এক লাখ আশরাফির প্রতিশ্রুতি

দেন। সুলতান অত্যন্ত অনুনয় বিনয় সহকারে অনুরোধ করেন যে, হযরত জামি যেন দয়াপরবশ হয়ে রোম (তুরস্ক) সাম্রাজ্যে তাশরিফ আনেন আর কয়েকটা দিন অবস্থান করেন, এখানকার জনগণকে সাহচর্য দানে ধন্য করেন। কিন্তু রোম সম্রাটের প্রতিনিধিদল পৌঁছার আগেই ইলহাম যোগে জ্ঞাত হয়ে তিনি দামেস্ক হতে হালাব চলে আসেন। তাতে প্রতিনিধিদল দামেস্কে জামিকে না পেয়ে মর্মাহত হন।
এই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রমাণ করে যে, ওসমানী সাম্রাজ্যের সুলতানগণ মওলানা জামির প্রতি অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। আর জামি শেষ জীবনটা রাজকীয় জাকজমক হতে মুক্ত হয়ে খোরাসানে নিরবিচ্ছিন্ন সাধনায় কাটানোর জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দেশে ফিরে আসেন। জামির দিওয়ানেও রোম (তুর্কি) সম্রাট সুলতান মুহাম্মদ এর নামে একটি মসনবি কবিতা আছে এবং তাতে তার বিজয়গাঁথা বর্ণিত হয়েছে। তার একটি ছত্র নিম্নরূপ:

از خراسان بیند بار نیاز
راه بردار ملک روم انداز

"খোরাসান থেকে নিয়ে চলো আর্জির বোঝা
রোম সম্রাটের দরবারে পেশ কর যত চাহিদা।"

সিলসিলাতুজ জাহার নামক মসনবি কাব্যের তৃতীয় খণ্ড- যা নিশ্চিতভাবেই হেজাজ সফর হতে ফেরার পর রচনা করেছেন, তাতে জামি সানি সম্রাট সুলতান বায়েজিদ এর প্রশংসা করেছেন। যেমন,

مهبة العز و العلی سلطان
بایزید ایلدرم شه دوران
خاک یونان زمین ازو گلشن
جان یونانیان ازو روشن"

সম্মান ও মর্যাদার আধার সুলতান
এ যুগের সম্রাট মহামতি বায়েজিদ।
তার কারণে গ্রিস ভূখণ্ড ফুলবনে পরিণত
গ্রিসবাসির মনপ্রাণ তার কল্যাণে আলোকিত।"

উক্ত কিতাবের শেষভাগেও সুলতানের প্রশংসা ও তার পাঠানো হাসিয়ার শোকরিয়া আদায় করে কবিতা রচনা করেছেন। জামি তার মসনবি কাব্য সিলসিলাতুজ জাহাব এর তৃতীয় খণ্ডটি শেষ করেছেন সুলতান বায়েজিদ এর নামে। অনুরূপভাবে জামি তার তৃতীয় দিওয়ান খাতেমাতুল হায়াত এর মধ্যে সুলতান বায়েজিদ খান এর নামে কয়েকটি কাসিদা রচনা করেছেন (হিকমত, ১৯৮৪: ৪৭-৪৮)।

মোটকথা জামি এমন এক যুগে বসবাস করতেন যে যুগে ইরান ভূখণ্ড গোত্র ও সম্প্রদায়গত বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে এক বিস্ময়কর অঙ্গণে পরিণত হয়েছিল। এক দিকে তৈমুরী শাহজাদারা শাসন করত, আরেকদিকে শাসন চালাত আগ কুয়ুনল তুর্কমানরা, আর অন্যদিকে শাসনকার্য পরিচালনা করত কারা কৃষুনল্ তুর্কমানরা। তৈমুরী শাসনের শেষদিকে উজবেক নামক আরেকটি জাতি কাপচাক উপত্যকা দিয়ে ইরানে প্রবেশ করে আর গোটা তুর্কিস্তান ও খোরাসান এর ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এহেন পরিস্থিতিতে জামি পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে বসবাস করতেন এবং বড় ছোট সর্বস্তরের সব মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সম্ভবত ইরানের কোনো কবি বা সাহিত্যিকের জীবনে এমন ভাগ্য আসে নি, যিনি একই সময়ে দুই বা ততোধিক রাজার মনযোগ ও সমাদর লাভ করেছেন। অথচ সাধারণত কোনো একজনের সমাদর পাওয়ার কারণে অন্যজনের বিরাগভাজন হতে হয়।

জামি একই সময়ে ইরান, রোম, মিশর ও ওসমানীদের মনোযোগের কেন্দ্রস্থল এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে সুউচ্চ আসন ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এই সৌভাগ্যের একমাত্র কারণ ছিল দুনিয়াবী ধন ঐশ্বর্য্যের প্রতি অনাগ্রহ, বড়লোকদের প্রশংসা বা জ্ঞানীদের তিরস্কারে কলুষিত না হওয়া, সীমাহীন বিনয় ও নম্রতা, ব্যাপক-বিস্তৃত জ্ঞান আর অসাধারণ বাগ্মিতা যার বদৌলতে মাঝে মধ্যে তিনি লোকদের উপদেশ নসিহত করতেন (তাওহিদীপুর, ১৯৮৭: ১৫৩-১৫৪)।

তাওহিদীপুর আরো লিখেছেন যে, জামি যখন হজ সফর থেকে ফিরছিলেন তখন ওসমানী সম্রাট সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ, অন্যদিকে মিশরের বাদশাহ মালেকুল আশরাফ তাদের কর্তৃত্বাধীন ভূখণ্ডে ফরমান জারি করেন, যাতে মওলানা জামিকে সর্বত্র শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

তাওহিদীপুর আরো বলেন, সামগ্রিক অর্থে বলা যায় যে, জামি হিজরি নবম শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক ও তাসাউফের ওস্তাদ আর ফারসি ভাষায় সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ সুফি কবি। তিনি কেবল কবিতায় নয়, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মীয় জ্ঞান ও হিকমত (প্রজ্ঞা) এর ক্ষেত্রেও অত্যন্ত যোগ্য ওস্তাদ ও পণ্ডিত ছিলেন।

এদিক থেকে অন্যান্য কবি সাহিত্যিকদের মাঝে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি তার জীবদ্দশায় সব সময় আম, খাস সর্ব সাধারণের মনোযোগের পাত্র ছিলেন। তখনকার দিনের রাজা বাদশাহ, আমির ও অভিজাত লোকদের মাঝে তিনি যেরূপ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন, ঐ সময় পর্যন্ত অন্য কোনো কবি সাহিত্যিক এরূপ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হতে পারেন নি।
জামির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মূলে ছিল ইরফান ও তাসাউফে তার বিরাট মর্যাদা ও সম্মান। এ কারণে তিনি তরিকতের অনুসারীদের কাছে একজন কুতুব ছিলেন (তাওহিদীপুর, ১৯৮৭: ১৫৭-১৫৮)।

ভারতবর্ষের সঙ্গে জামির সম্পর্ক

মওলানা আব্দুর রহমান জামি তার জীবদ্দশায় ভারতবর্ষ সফর করেন নি। কোনো জীবনীকার এমন তথ্য জানান নি; কিংবা তার রচনাবলিতেও এ ধরনের কোনো উল্লেখ বা ইঙ্গিত ইশারা নেই। তবে ভারতবর্ষে জামির অশরীরি সফর তার জীবদ্দশায় যেমন হয়েছে, তার ইন্তেকালের পর আরো বিস্তৃত ব্যাপক আকারে হয়েছে। পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের মানসপটে যে ভারতবর্ষের চিত্র সেখানকার ধর্মীয় মহলে। জামি এখনো সমাদৃত। তার একটি প্রমাণ আমার এই গবেষণা। ভারতবর্ষের সকল দ্বীনি মাদ্রাসায় আরবি সাহিত্যের একটি উচ্চতর ব্যাকরণ পঠিত হত। এখনো কওমি মাদ্রাসাগুলোতে তা সিলেবাসভুক্ত। সেই কালজয়ী গ্রন্থটি হচ্ছে শরহে জামি। জামির রচনাবলি পরিচিতি পর্বে এ গ্রন্থের উপর বিশদ আলোচনা করব। উপমহাদেশের রাসুল (সা.) এর প্রশস্তি ও নবি প্রেমের যে সংস্কৃতি তার মূলে রয়েছে জামির লেখনি ও অনুপ্রেরণা। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম জামির অনূকরণে অনেক হামদ ও নাত রচনা করেছেন (ইসলাম, ১৯৮৪: ৪৭৭)।
জামির এই না'ত এখনো আমাদের ধর্মীয় মাহফিলগুলোতে গীত হয়। শ্রোতারা ফারসির অর্থ না বুঝলেও নাত এর সুরের মূর্ছনায় আপ্লুত হয় নবি প্রেমের গভীর তন্ময়তায়। ধর্মীয় মহলে প্রচলিত অন্যান্য নাতসমূহকে সামনে রাখলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আমাদের সমাজে আবহমানকাল হতে বিরাজমান নবি প্রেম প্রধানত জামির রচনাবলি ও চিন্তাধারার দ্বারা পল্লবিত ও বিকশিত হয়েছে (নদভী, ২০০০: ২০০-২৩৫)।

শুধু কি তাই, ইসলামের ইতিহাসের শুরু থেকে বিভিন্ন মনীষীকে কেন্দ্র করে ভক্তি বা বিরাগের সূত্রে নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। তন্মধ্যে শিয়া সুন্নির বিভাজন ঐতিহাসিক। শিয়া সম্প্রদায় প্রথম তিন খলিফাসহ এমন বহু বুজুর্গানে দ্বীনকে ধর্মীয় পুরোধা হিসেবে গ্রহণ করে না, সুন্নি সম্প্রদায়ের কাছে যারা

প্রাতঃস্মরণীয়। তার বিপরীতে তারা আহলে বাইতের ইমামগণকেই শ্রদ্ধা করেন, প্রাধান্য দেন ও অনুসরণ করেন। হতে পারত প্রতিদ্বন্দ্বি সুন্নিরা আহলে বাইতের ইমামগণকে শিয়াদের ইমাম বলে বর্জন করবে। কিন্তু এমনটি হয় নি বরং সুন্নি সম্প্রদায় মুসলিম উম্মাহর প্রধান ধারার ইমাম ও ধর্মীয় পুরোধাদের যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, তেমনি আহলে বাইতের ইমামগণকেও সমানভাবে; এমন কি আরো বেশি মাত্রায় শ্রদ্ধা করেন। নামাজের শেষ বৈঠকে দরূদে ইব্রাহিমিতে তাদের প্রতিও দরূদ পাঠায়, রহমত ও বরকত কামনা করে। ভক্তি ও বিশ্বাসের এই ঐতিহ্য ও ব্যাপকতা উপমাহাদেশের মুসলমানদের মনে মগজে প্রোথিত। এর সূত্র ও উৎস অনুসন্ধান করলে যে মনীষীর অবদানের কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নূয়ে যাবে তিনি হলেন মওলানা জামি (রহ.)। তিনি শাওয়াহেদুন নবুয়াত' গ্রন্থে শিয়া সম্প্রদায়ের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় ইমামগণকে যেভাবে পরম ভক্তি শ্রদ্ধায় গভীর ভালবাসায় তুলে ধরেছেন, মূলত আমরাও সেভাবে তাদেরকে স্মরণ করি, তাদেরকে আমাদের ঈমান ও ইসলামের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসাবে জানি। উপমহাদেশের সুন্নি সমাজ কখনো চিন্তাও করেন না যে, শিয়া সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় আহলে বাইতের ইমামগণ শিয়াদের ইমাম বরং তারা সুন্নিদেরই ইমাম। রাসূলে খোদা (স.) এর বংশধর হিসেবে আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র।

এতো গেল, উপমহাদেশে জামির ইন্তেকাল পরবর্তী এ পর্যন্ত বিরাজমান প্রভাব সম্পর্কিত মূল্যায়ন। জামির জীবদ্দশায়ও ভারতবর্ষের সাথে পত্র যোগাযোগের তথ্য পাওয়া যায় তার পত্রাবলিতে । তন্মধ্যে কয়েকটি পত্র লেখা হয়েছে হিন্দুস্তানের মালিকুত তুজ্জার (ব্যবসায়ীদের রাজা) নামক এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে। মূলত: এগুলো হচ্ছে জবাবী পত্র। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি বা তার ছেলে 'খাজা আলী' যেসব পত্র লিখতেন জামি তার উত্তর দিয়েছেন আধ্যাত্মিক সুক্ষ্মতত্ত্ব ও অত্যন্ত আবেগ ও প্রেরণা মিশ্রিত দীর্ঘ পত্রের মাধ্যমে। পত্রগুলোতে বিভিন্ন আরবি ও ফারসি বেইতের উদ্ধৃতিও রয়েছে। জামি তার সম্বোধিত ব্যক্তিটিকে একটি পত্রে জালাল উদ্দিন গিয়াসুল ইসলাম নামে আখ্যায়িত করেছেন (তাওহিদপুর, ১৯৮৭: ১৫৭-১৫৮)।

এতে প্রমাণিত হয় যে, জামির জীবদ্দশাতেই ভারতবর্ষের সাথে তার যোগাযোগ ছিল এবং কবি ও আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে তার খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, জামির জীবদ্দশাতেই ভারতবর্ষের সাথে তার যোগাযোগ ছিল এবং কবি ও আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে তার খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আব্দুর রহমান জামির (র.) রচনাবলি ও কবিমানস

আব্দুর রহমান জামির (র.) রচনাবলি ও কবিমানস

ফারসি কাব্য ও সাহিত্যের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ কবি মওলানা আব্দুর রহমান জামি কবিতা ও সাহিত্যে সমান দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তিনি জীবনের বেশির ভাগ অংশ কাব্যচর্চা ও সাহিত্য রচনায় অতিবাহিত করেন। তাঁর রচনার মূল প্রতিপাদ্য আল্লাহ ও রাসুল প্রেম, তাফসির, ফিকাহ, হাদীস, আরবি ব্যাকরণ অলংকার শাস্ত্র, ধাঁ ধাঁ, তাসাউফ এবং ইসলামের সৌন্দর্য ও নৈতিক শিক্ষাসমূহের মনোজ্ঞ বর্ণনা। জামির রচনাবলির খ্যাতি, প্রভাব ও সমাদর সম্পর্কে আমাদের জন্য এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, তিনি গদ্যে বা পদ্যে যা কিছু লিখেছেন সাথে সাথে লোভনীয় বস্তুর মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই লেখনির গুণেই তিনি এমন উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হন যে, তাঁর জামানার রাজা বাদশাহদের সাথে তিনি পত্র বিনিময় করেন এবং সুলতানগণের নামে হাদীয়া হিসাবে তার কোনো না কোনো কিতাব উপঢৌকন পাঠান। এমন কি রাজা বাদশাহগণ পরস্পরের কাছে মওলানা জামির রচিত কিতাব উপঢৌকন হিসাবে পাঠাতেন। জামির রচনাবলি অধ্যয়নে প্রতীয়মান হয় যে, কনস্টান্টিনোপল হতে নিয়ে ভারতবর্ষ, সামারকান্দ হতে নিয়ে শিরওয়ান ও তাবরিয পর্যন্ত সমসাময়িক সকল সুলতান, আমির, শীর্ষস্থানীয় আলেম, জানীগুণি ও মন্ত্রীবর্গের সাথে জামির চিঠিপত্র আদান প্রদান হয়েছে এবং তারা তার রচনাবলি পাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। একই কারণে এশিয়া ও ইউরোপের গ্রন্থাগারগুলোতে তার গদ্য ও পদ্য রচনার বিভিন্ন নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ও সংরক্ষিত আছে। জামির রচনাবলি সম্পর্কে প্রথম নির্ভরযোগ্য সূত্র তেহরান হতে মুদ্রিত তোহফায়ে সামি। বিভিন্ন সূত্রে জামির শতাধিক রচনার তথ্য পাওয়া যায়। তবে এর সংখ্যা ৪৫টি বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়। তালিকাটি নিম্নরূপ :

نفحات الانس

১. شواهد النبوة শাওয়াহেদুন নবুয়াত

২. نفحات الانس নাফাহাতুল উনস

৩. اشعة المعات আশআতুল লামাআত

৪. شرح فصوص الحكم শরহে ফুসুল হিকাম

৫. لوامع লাওয়ামে

৬. تفسير قرآن كريم تا آية و ايأى فار هبون তাফসীর ওয়া ইয়্যায়া ফারহাবূন আয়াত পর্যন্ত

৭. شرح بعضى ابيات تائيه فارضيه শরহে বা'যী আবয়াতে তাইয়া ফারেযিয়া

৮. شرح رباعيات শরহে রূবাইয়াত

৯. لوايح লাওয়ায়েহ

১০. شرح بيتى چند از مثنوبى مولوى মওলানার কয়েকটি মসনবি বেইত এর ব্যাখ্যা

১১. رسالة في الوجود রোসালা ফিল ওজুদ

১২. ترجمۀ اربعين حديث তারজুমা আরবাঈন হাদীস

১৩. رساله لا اله الا الله রেসালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

১৪. مناقب خواجه عبد الله انصارى মানাকেবে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী

১৫. رسالۀ تحقيق مذهب صوفى و متكلم و حكيم এটি উত্তর এসি আছে মা, সুফী, তর্কশাস্ত্রবিদ ও হাকীমদের মাযহাব সম্পর্কিত গবেষণামূলক পুস্তিকা

১৬. رساله سؤال و جواب هندوستان হিন্দুস্তান এর প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত রেসালা

১৭. رسالۀ مناسک حج এ হজ এর মাসয়ালা সম্পর্কিত রেসালা

১৮. سلسلة الذهب সিলসিলাতুজ জাহাব

১৯. لامان وابسال সালামান ওয়া আবসাল

২০. تحفة الاحرار তোহফাতুল আহরার

২১. سبحة الابرار সুবহাতুল আবরার

২২. يوسف و زليخا ইউসুফ ও জুলাইখা

২৩. ليلى و مجنون লাইলি ও মাজনূন

২৪. خردنامۀ اسكندرى খেরাদনামায়ে ইস্কান্দরী

২৫. رساله در قافيه রেসালা দর কাফিয়া

২৬. ديوان اول দিওয়ানে আউয়াল

২৭. ديوان ثاني দিওয়ানে সানি

২৮. ديوان ثالث দিওয়ানে সালেস

২৯. رسالۀ منظومه রেসালায়ে মনযুমা

৩০. بهار ستان বাহারিস্তান

৩১. رسالۀ كبير در معما রেসালায়ে কবীর দর মুআম্মা

৩২. ساله متوسط রেসালায়ে মুতাওয়াসসাত

৩৩, رساله صغير রেসালায়ে সগীর

৩৪. رساله اصغر درمعما রেসালায়ে আসগর দর মুআম্মা

৩৫. رساله عروض রেসালায়ে আরূয

৩৬. رساله موسيقى রেসালায়ে মুসিকি

৩৭. منشأت মুনশাআত

৩৮. فوائد الضيائيه فى شرح القافيه ফাওয়ায়েদুস যিয়াঈয়া ফী শারহিল কাফিয়া

৩৯. شرح بعضى از مفتاح الغيب منظوم و منثور গদ্য ও পদ্যে লেখা মিফতাহুল গায়ব-এর আংশিক ব্যাখ্যা

৪০. نقد النصوص নকদুন নুসূস

৪১. رسالۀ طريق صوفيان রেসালায়ে তরিকে সুফীয়ান

৪২. شرح بيت خسر و دهلوى শরহে বায়তে খসরু দেহলভি

৪৩. مناقب مولوى মানাকেবে মওলভি

৪৪. سخنان خواجه پارسا সুখানানে খাজা পারসাঅবশ্য আমির আলী শির খান মারআতুল খেয়াল

গ্রন্থে জামির রচনাবলির সংখ্যা ছোটবড় মিলে, মোট ৯৯টি বলে উল্লেখ করেছেন শির, ...:৭৩)। তবে তিনি তার দাবির স্বপক্ষে রচিত কিতাবের তালিকা দেন নি। মওলানার একনিষ্ঠ শিষ্য মওলানা আব্দুল গফুর লারী মওলানার রচনাবলির সংখ্যা ৪৮টি বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তোহফায়ে সামির চাইতে অতিরিক্ত তিনটি। এগুলো হচ্ছে

১ شرح ابى رزين عقيلى শরহে আবি রাজিন ওকাইলি

২। رساله فى الواحد রেসালা ফিল ওয়াহেদ

৩। صرف فارسى منظوم و منثور সরফে ফারসি মনযূম ওয়া মনসূর।

আলী আসগর হিকমত এর মতে লারীর দেয়া তালিকা তোহফায়ে সামির তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য (হিকমত, ১৯৮৪: ১৬৩)। নিম্নে জামির (র.) বিশেষ কয়েকটি কিতাবের রচনার প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু তুলে ধরা হল,

নবুয়তের বর্ণনা

একটি ভূমিকা, ৭টি অধ্যায় ও একটি উপসংহার সম্বলিত এই গ্রন্থটিতে হযরত (স.) এর জন্মের পূর্বে, শৈশবে, নবুওয়াতের আগে, হিজরতের পরে ও ওফাতের আগে পরে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করেছেন। আহলে বাইতের ইমামগণ, খোলাফায়ে রাশেদীন, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনদের

জীবনচরিতও আলোচিত হয়েছে; যা প্রকারান্তরে রাসূলে পাকের নবুওয়াতের প্রমাণপঞ্জির অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাদের মাধ্যমে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাবলিও মূলত হযরত (স.) এর বদৌলতেই সংঘটিত হয়েছে। নবুয়াতের ফজিলতসমৃদ্ধ বিধায় মূলত এগুলোও হযরতের (স.)নিজস্ব গুণ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। হিজরি ৮৮৫ সালে এটি রচনা করেন রচনার তারিখ সম্পর্কিত জামির একটি পংক্তি

در آن وقت اتمام آن دست داد

که تممته بود تاریخ سال

হাদারাতিল কুদস

কিতাবটির পুরো নাম 'নাফাহাতুল উনস মিন হাদারাতিল কুদস'। অইমর নিজাম উদ্দিন আলী শির এর অনুরোধে মওলানা জামি তার সময় থেকে পূর্বেকার বুজুর্গগণের জীবনচরিত ভিত্তিক এ গ্রন্থটি রচনা শুরু করেন ৮৮১ হিজরিতে। মাত্র দুই বছরের মধ্যে ৮৮৩ সালে তার রচনার কাজ শেষ করেন। ৫৮২ জন বুজুর্গ সুফি ও ৩৪ জন মহিলা বুজুর্গের জীবনী সম্বলিত এই গ্রন্থটিতে তাদের জীবনচরিত, তাসাউফ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি, অভিমত, কারামাত, শিক্ষা আর ঘটনাবলি তুলে ধরা হয়েছে। শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র)-এর তাযকিরাতুল আউলিয়ার আদলে লেখা এই গ্রন্থটি হিজরি নবম শতকের ফারসি গদ্য সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কিতাবটির রচনাকাল সম্পর্কিত একটি চতুষ্পদি নিম্নরূপ

این نسحهٔ مقتبس ز انفاس کرام

کزو نفحات انست آید بمشام

از هجرت خیر بشر و فخر انام

در هشتصد و هشتاد وسوم گشت تمام

রেসালায়ে কাবির দার মুআম্মা

এটি সাহিত্যের ধাঁ ধাঁর নীতিমালা বিষয়ক বড় পুস্তিকা। কিতাবটির প্রসিদ্ধ নাম 'হুলিয়ায়ে হুলাল'। কিতাবটি মওলানার প্রাচীনতম রচনা এবং হেরাত ও খোরাসানের বাদশাহ মির্জা আবুল কাসেম বাবর এর (মৃত্যু ৮৬১ হিজরি) নামে উৎসর্গীকৃত। বইটি মূলত: মওলানা শরফ উদ্দিন আলী (মৃত্যু ৮৫৮হিজরি) ইয়াযিদ রচিত 'হুলালে মুতার্য দর মুয়াম্মা ও লাগায' নামক একটি কিতাবের সারসংক্ষেপ। রচনাকাল ৮৫৬ হিজরি। এটি তার প্রথম জীবনের রচনা। এর প্রথম দুটি বেইত-

نام شاه اندر معما گفته به

زان که آن دراست و در ناسفته به

نامش ار خواهم بگویم آشکار
از شکوه افتد زبان من زکار

রেসালায়ে সাগির দার মুয়াম্মা

এই রেসালার রচনাকাল জানা যায় না, তবে অনুমান করা যায় যে, সুলতান হুসাইন মার্মার শাসনামলে ও তার জীবনের শেষভাগে এটি রচিত। এই কিতাবটিও সার অলংকার বিষয়ক আল্লাহর পবিত্র নামের মহিমা নিয়ে এভাবে শুরু করা হয়েছে-

بنام آنکه ذات او زاسما
بود پیدا چو اسما از معمی
معمائیست عالم کانچه خواهی
در او پیداست اسماء الهی

রেসালা দার ফান্নে কাফিয়া

কোনো কোনো সূত্রে এটি 'আর-রেসালাতুল ওয়াফিয়া ফি ফালি কাফিয়া' নামে উল্লেখিত হয়েছে এটি কবিতার অন্ত্যমিল সম্পর্কিত অলংকার শাস্ত্রীয় কিতাব। এর একটি বেইত উল্লেখ করছি-

خصم شتر دلت را قربان همی کند
زآنروی سعد ذابح آهخته کاردست

নাকদুন নুস ফি শারহে নাকশিল ফুসুস

এ কিতাবটি শেখ মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনুল আরাবি (৫৬০-৬৩৮ হিজরি) রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ফুস-উল হিকাম'-এর সার সংক্ষেপ। শেখ মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আল আরাবি; ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফি, তাত্ত্বিক জন্ম ৫৬০ হিজরি ও ইন্তেকাল ৬৩৮ হিজরি। তিনি ওয়াহদাতুল ওজুদ (একক অস্তিত্ববাদ) মতাদর্শের প্রবক্তা। তিনি ৫৫৮ হিজরিতে এশবিলিয়ায় (ফ্রান্সের দক্ষিণে একটি নগরী) গমন করেন এবং দীর্ঘ ৩০ বছর সেখানে বাস করেন ও সেখানে হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এরপর তিউনিসিয়া গমন করেন। সেখান থেকে প্রাচ্য দেশীয় অঞ্চলসমূহ ও এশিয়া মাইনর সফর করেন। দুইবার মক্কা ও দুইবার বাগদাদ গমন করেন। সর্বত্র তিনি সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তবে ব্যতিক্রমী আধ্যাত্মিক দর্শনের কারণে জাহেরি আলেম ও ফকিহগণের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। জীবনের শেষ পর্যায়ে দামেস্ক গমন করেন ও সেখানেই সমাহিত হন। তার বিশ্ববিখ্যাত দু'টি গ্রন্থের নাম ফতুহাতে মক্কিয়া ও ফুসসুল হিকাম । গ্রন্থ দু'টি আধ্যাত্মিক বিষয়

সংক্রান্ত অতিশয় সুক্ষ্ম, জটিল ও বিস্তৃত। তিনি শেষোক্ত গ্রন্থটির সাবলিল ব্যাখ্যা করেন। এতে ফুসসুল হিকাম এর অন্যান্য বিগদ্ধ ব্যাখ্যাকার শেখ সদরুদ্দিন কূনাভি[২৬] শেখ মুআইয়াদ উদ্দিন জুনদি[২৭] ও শেখ সা'দ উদ্দিন সাঈদ আল ফারগানি[২৮] এর মতামতও তিনি তুলে ধরেছেন। ফারসি ও আরবি ভাষায় গদ্যরীতিতে লেখা গ্রন্থটি বজুর্গানে দ্বীনের উক্তি সম্বলিত ফারসি বেইত এর অলংকার দিয়ে সাজানো। হিজরি ৮৬৩ সালে এর রচনা সমাপ্ত হয়।

লাওয়ায়েহ

ছন্দোবদ্ধ ফারসি গদ্যে লেখা এই ছোট কিতাবটি বিভিন্ন আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে 'লাওয়ায়েহ' বা অধ্যায় আকারে সাজানো হয়েছে। কিতাবটি সম্ভবত ৮৭০ হিজরিতে লেখা। বইটি হামাদান, ইরাক (পূর্ব) ও আজারবাইজানের শাসক জাহান শাহ কারা কানপুর নামে উৎসর্গকৃত (উৎসর্গ সম্পর্কিত দু'টি বেইত নিম্নরূপ-

سفتم گهری چند چو روشن خردان
در ترجمه حدیث عالی سندان
باشد زمن هیچ مدان معتمدان
این تحفه رسانند به شاه همدان

লাওয়ামে ফি শারহিল খামরিয়া

বিখ্যাত আরবি কবি ও সুফি সাধক শেখ উমর ইবনে আবুল হাসান ইবনে ফারে (৫৭৬ ৬২৩২হিজরি)-এর বিখ্যাত খামরিয়া কাসীদার শরাহ বা ব্যাখ্যা হিসেবে মওলানা জামি (র) এই কিতাবটি রচনা করেন। রচনাকাল আনুমানিক ৮৭৫ হিজরি। আরবি হতে তরজমার একটি নমুনা-

شربنا على ذكر الحبيب مدامة
سكرنابها من قبل ان يخلق الكرم
روزی که مدار چرخ و افلاک نبود
وآمیزش آب و آتش و خاک نبود
بر یاد تو مست بودم و باده پرست
هر چند نشان داده و تاک نبود

সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সদরুদ্দিনকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন। তিনি ইবনুল আরাবির শীর্ষস্থানীয় শিষ্যে পরিণত হন। শাফেয়ি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। কৃনিয়ায় বাস করতেন ও মওলানা জালালুদ্দিন রুমির সমসাময়িকছিলেন। তার রচনাবলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হচ্ছে সূরা ফাতিহার তাফসীরগ্রন্থ এজায আল-বয়ান, তাসাওফ বিষয়ক মিফতাহুল গায়ব ও আন নুসুস, শরহে আসমাউল হুসনা ।

রেসালা আরকানুল হজ

এই রেসালাটি ফারসি ভাষায় রচিত। তবে মাঝে মাঝে আরবি ভাষা মিশ্রিত। হজ ও ওমরার ফরজ, ওয়াজিব, মুস্তাহাব এবং মদিনা মুনাওয়ারায় নবি করিম (স.) এর রওজা শরীফ ও জান্নাতুল বাকীতে ইমামগণের কবর জিয়ারতের নিয়মাবলি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নববির বরাতে এই রেসালায় লেখকের টীকাও সন্নিবেশিত হয়েছে। ইসলামি ফিকাহ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এই রেসালাটির রচনাকাল ৮৭৭ হিজরির শাবান মাস। হজের উদ্দেশ্যে যাবার পথে তা বাগদাদে রচনা করেন। রেসালাটির শুরু এভাবে

الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام مثابة للناس
و احل طوائف الطائفين حولها محل الائتلاف بها والاستيناس.

সুখানানে খাজায়ে পারসা

এটি একটি ছোট্ট রেসালা। খাজা মুহাম্মদ পারসার প্রতি অতিশয় ভক্তির কারণে তার জীবনী ও কিছু উক্তি আর শিক্ষা এই রেসালায় গ্রন্থিত করেছেন। খাজা মুহাম্মদ পারসা বুখারী নকশবন্দিয়া তরিকার একজন শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ ছিলেন। জামি তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন এবং তার দুআ ও ফুযাত এর বরকত লাভে ধন্য হওয়ার কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করতেন। পাঁচ বছর বয়সে তার দর্শন লাভ এবং তার কাছ থেকে তাবাররুক লাভের স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি নাফাহাতুল উন্‌স গ্রন্থে। সে সময় খাজা জ্জর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। তিনি হিজরি ৮২২ সালে মদিনা মুনাওয়ারায় ওফাত লাভ করেন। রচনাকাল অজ্ঞাত রেসালাটি শেষ করেছেন এভাবে-

....ولكن لا يجوز ان يغفل عن تبعية نوره لنور الشمس...

আশআতুল লামাআত

এটি শেখ ফখরুদ্দিন ইব্রাহীম হামাদানি, প্রকাশ ইরাকীর লেখা 'লামআত' গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। মওলানা জামির বন্ধু ও শিষ্য আমির আলী শির নাওয়ায়ির অনুরোধে তিনি এটি রচনা করেন এবং তাতে শেখ মহিউদ্দিন ইবনে আরাবি ও তার শিষ্য সদরুদ্দিন কৃনাভি ও অন্যান্য আরেফগণের বিভিন্ন উক্তি ও অভিমতের সাহায্য নেন। তাসাউফের জটিল পরিভাষা সম্পর্কিত ২৮টি লামআ বা অধ্যায়ে বিন্যস্তগ্রন্থটির রচনাকাল হিজরি ৮৮৬ সাল। তখন মওলানার বয়স ৬৯ বছর রচনাকাল সম্পর্কে জামি বলেন-

بآثام هستی است جامی اثیر مَحی الله آثار آثامه
بتسوید این شرح توفیق یافت مقراً بزلات اقدامه
اذا قال اتممته قد بدا بما قال تاریخ اتمامه

চেহেল হাদীস

উম্মতের মাঝে চল্লিশটি হাদীসের চর্চাকারী বেহেশতে যাবে বলে নবি করিম (স.) এর দেয়া সুসংবাদের প্রত্যাশায় অন্যান্য বুজুর্গদের মতো মওলানা জামি(র) এ রেসালাটি রচনা করেন। এর বিষয়বস্তু সুন্দর চরিত্র ও উচ্চতর সুক্ষ্ম ভাবধারা সম্পর্কিত। চল্লিশটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই কাব্যগ্রন্থটির রচনাকাল ৮৮৬ হিজরি। একটি হাদীসের তরজমার উদাহরণ-

الكلمة الاولى

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

ترجمتها

هرکسی را لقب مکن مؤمن گرچه از سعی جان و تن کاهد
تا نخو اهد برادر خود را آنچه از بهر خویشتن خواهد

রেসালা তাজনিসে খাত

আরবি শব্দসমূহের আঙ্গিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থের বৈচিত্র দেখিয়ে রচিত এই রেসালাটির রচনাকাল জানা যায়নি। একটি উদাহরণ-

مصر شهر و شهر ماه و ماه آب و خوف سهم
سهم تیر و اجنحه چه بسال باشد بال جان

মাসনাবিয়্যাতে হাফতে আওরাঙ্গ

বিভিন্ন সময়ে রচিত সাতটি দ্বিপদী কাব্যগ্রন্থের এই সংকলনটি হাফতে আওরঙ্গ নামে খ্যাত। এর অর্থ সাতভাই বা সাত তারকা-সপ্তর্ষিমণ্ডল। এ সম্পর্কে তার উক্তি-

این هفت سفینه در سخن یکرنگ اند
وین هفت خزینه در گهر همسنگ اند
چون هفت برادران برین چرخ بلند
نامی شده در زمین بهفت اورنگ اند

জামি (র) কবি নিজামি ও আমির খসরু দেহলভির পাঁচ মসনবি কাব্য 'খামসা' এর আদলে প্রথমে পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এরপর আরো দু'টি কাব্যগ্রন্থ সংযোজন করেন। উল্লেখিত মসনবি গ্রন্থগুলোর পরিচয় হচ্ছে;

১. প্রথম মসনবি গ্রন্থ : সিলসিলাতুজ জাহাব। নিম্নে এ গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো,

প্রথম দফতর

সুলতান হুসাইন বায়কারা-র সিংহাসন আরোহনকাল ৮৭৩ হিজরি হতে হজ্বের সফরের বছর ৮৭৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি এই কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। হাদীস আর ইমামগণ ও বুজুর্গানে দ্বীনের উক্তির ব্যাখ্যা সম্বলিত এই কাব্যগ্রন্থে জব ও ইখতিয়ার, নিয়তি, নবুয়াত, ইমামত, জগতের প্রাচীনত্ব ও নতুনত্ব প্রভৃতি কালাম শাস্ত্রীয় বিষয়। আর শরিয়তের বিধানাবলি- যেমন নামাজ, রোজা, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতির নিয়মাবলি আর জিকির, নির্জনবাস, নীরবতা, ক্ষুধা প্রভৃতির মতো আধ্যাত্মিক বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে নানা ঘটনা ও গল্প কাহিনির আদলে। শেষভাগে আপন মুর্শিদের ছেলে উবায়দুল্লাহ আহরার এর অনুরোধে ইতেকালনামা নামে ইসলামি আকিদা বিশ্বাস সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা সন্নিবেশিত করেন । এর প্রথম বেইত-

الله الحمد قبل کل کلام

بصفات الجلال و الاكرام

দ্বিতীয় দফতর

আধ্যাত্মিক প্রেমের বিভিন্ন আঙ্গিকের বর্ণনা আর প্রেমের শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণাধর্মী এই কাব্যগ্রন্থে প্রতিটি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিষয়ের বিশ্লেষণে বুজুর্গানে দ্বীনের জীবন থেকে একেকটি কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন। তার সাথে কুরআন ও হাদীসের যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। কাহিনীগুলো অনেক ক্ষেত্রে রসাত্মক হওয়ায় গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য। যেসব বুজুর্গানে দ্বীনের জীবন থেকে তিনি উদ্ধৃতি এনেছেন তারা হলেন বায়েজিদ বোস্তামী, জুনুম মিসরি, শাহ শুজা কেরমানি, শামসে তাবরিযি, শেখ আওহাদ উদ্দিন কেরমানি, ফতুহাতে মক্কিয়া রচয়িতা শেখ মুহিউদ্দিন আরাবি, শেখ আলী মুয়াফাক, মারুফ কারখী, বেশর হাফি, আহমদ ইবনে হাম্বল (যদিও তাকে সুফি বলে গণ্য করা হয় না) আবূ আলী রুদবারি, সিররি সতি, তোহফায়ে মোগনিয়া রচয়িতা শেখ আবু আলী দাক্কাক। হেজাজ সফর হতে ফিরে আসার পরে ৮৯০ হিজরি সালে এর রচনা সমাপ্ত করেন। প্রেমের মহিমা বর্ণনার মাধ্যমে গ্রন্থটি শুরু করেছেন এভাবে-

بشنو ای گوش بر فسانه عشق
از صریر قلم ترانه عشق
قلم اینک چو نی بلحن صریر
قصه عشق می کند تقریر

তৃতীয় দফতর

প্রায় ৫০০ বেইত (শ্লোক) এর এই সংক্ষিপ্ত মসনবিটি ওসমানী সম্রাট সুলতান বায়েজিদ খান দ্বিতীয় এর নামে উৎসর্গিত। উক্ত সুলতান জামির ওফাত (৮৯৮ হিজরি) এর পূর্বে ৮৮৬ সাল হতে ৯১৮ সাল পর্যন্ত ১২ বছর ইস্তাম্বুলে রাজত্ব করেন। নগর শাসন, রাজ্য পরিচালনা, ন্যায়-ইনসাফ প্রসঙ্গ ও রাজা-বাদশাহদের উদ্দেশ্যে নসিহত সম্বলিত এই কাব্যগ্রন্থটিও নানা উপমা ও কাহিনীরআস্বাদন সহযোগে পরিবেশিত। এর রচনাকাল ৮৯০ হিজরির পরবর্তী সময়ে সুলতান বায়েজিদ এর প্রশংসায় ভূমিকায় তিনি বলেন-

مهبة العز و العلی سلطان

بایزید ایلدرم شه دوران
خاک یونان زمین ازو گلشن
چشم یونانیان ازو روشن

সম্মান ও মর্যাদার আধার সুলতান
এ যুগের সম্রাট মহামতি বায়েজিদ ।
তার কারণে গ্রিস ভূখণ্ড ফুলবনে পরিণত
গ্রিসবাসীর দু'নয়ন তার কল্যাণে আলোকিত।"

দ্বিতীয় মসনবি গ্রন্থ : সালামান ও আবসাল

এই কিতাবটি সুলতান ইয়াকুব তুর্কমান আগ কুয়ুনুল-এর নামে রচিত। জামি এ গ্রন্থের শুরুতে উক্ত সুলতানের প্রশংসা করেন। উক্ত কাব্যগ্রন্থে সুলতানের পিতা আমির কবির হাসান বেগ অর্থাৎ ইরাক ও আজারবাইজান বিজেতা উথুন হাসান এবং তার ভাই ইয়াকুব বেগ ওরফে আমির ইউসুফ এর নামোল্লেখ রয়েছে। মওলানা জামি আনুমানিক ৮৮৪ সালে এ কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। সুলতান ইয়াকুব তুর্কমান আগ কুয়ুনুলের প্রশংসায় শুরুতে তিনি বলেন-

شاه یعقوب آن جهانداری که هست
با علوش ذروۀ افلاک پست

তৃতীয় মসনবি গ্রন্থ : তোহফাতুল আহরার

হাকিম নিজামির মাখযানুল আসরার ও আমির খসরু দেহলভির মাতলাউল আনোয়ার এর আদলে জামি এই দ্বিপদী কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। কিতাবটি ২০টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব, মানব সৃষ্টির রহস্য, ইসলামের আনিত সৌভাগ্য, পাঁচওয়াক্ত নামাজ, জাকাত, বায়তুল্লাহ শরীফের জিয়ারত, নির্জনবাস, সুফি, জাহেরি আলেম, রাজা বাদশাহ, মন্ত্রী ও সচিবদের অবস্থা, বার্ধক্য, তারুণ্য, রূপ সৌন্দর্য, প্রেম, সন্তান জিয়াউদ্দিনের প্রতি উপদেশ ইত্যাদি। কিতাবের শুরু এভাবে-

بسم الله الرحمن الرحیم هست صلای سر خوان کریم

চতুর্থ মসনবি গ্রন্থ :

হিজরি ৮৮৮ সালে এই কাব্যগ্রন্থটি রচিত এবং সুলতান হুসাইন কায়কারা-র নামে উৎসর্গিত। চল্লিশটি আকদ বা বিষয়ে বিন্যস্ত কিতাবটির বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে মনের হকিকত, বাগ্মিতারস্বরূপ, অস্তিত্বের হাকিকত, তাসাউফ, ভক্তি, তওবা, দুনিয়া বিরাগ, দারিদ্র, সবর, শোকর, ভয়, তাওয়াক্কুল, রেখা, মহব্বত, প্রেরণা, আত্মমর্যাদা, লজ্জা, মুক্তচিন্তা, সততা, প্রফুল্লতা, সামা, রাজা, বাদশাহদের রাজত্ব বিলাস, সুলতানদের প্রতি প্রজাদের কৃতজ্ঞচিত্ততা প্রভৃতি। অতীব সূক্ষ্ম ও মননশীল কাব্যগ্রন্থটির কাব্যরীতি স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্কর। কিতাবের শুরু এভাবে-

ابتدی باسم اله الرحمن الرحیم المتوالي الاحسان

পঞ্চম মসনবি গ্রন্থ : ইউসুফ জুলাইখা

নাম থেকে যেমন বুঝা যায়, এই মসনবি কাব্যগ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য কুরআন মজিদে বর্ণিত (সূরা নং ১২) হযরত ইউসুফ (আ) ও মিসরের অধিপতির স্ত্রী জুলাইখা তার ওপর আসক্ত হওয়ার পূর্বাপর ঘটনা। তবে ঘটনার শাখা-প্রশাখা বর্ণনায় জামি ইসলামি সূত্রের বর্ণনার চাইতে তাওরাত (বাইবেল) সূত্রের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন শুরুতে রাসুলে পাক (স.) এর না'ত শরীফ, মে'রাজ এর বর্ণনা, আপন পির মুর্শিদ খাজা ওবায়দুল্লাহ নকশবন্দ এর নাম নিয়ে বরকত হাসিল আর সুলতান হুসাইন বায়কারার প্রশংসা বিধৃত রয়েছে। মক্কা শরীফ হতে মদিনায় যেতে স্বপ্নযোগে রাসুলুল্লাহ (স.) এর নির্দেশে বাধাগ্রস্ত হওয়ার বিস্ময়কর ঘটনা নির্ভর না'তটি এই কাব্যগ্রন্থের শুরুতে বিধৃত। জামির সবচেয়ে বিখ্যাত মসনবি ইউসুফ জুলাইখার রচনাকাল ৮০৮ হিজরি। এর অপর নাম মহব্বত নামা। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির আরম্ভ হয়েছে এভাবে

الهی غنچه امید بگشای گلی ناز روضه جاوید بنمای

ষষ্ঠ মসনবি গ্রন্থ : লাইলি ও মাজনূন

নিজামি ও আমির খসরু দেহলভির লাইলি মজনু নামক দু'টি স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থের আদলে ও অনুকীর্তিতে প্রেমাসক্তির বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা এ কাব্যগ্রন্থের সূচনায় যথানিয়মে আল্লাহ পাকের প্রশংসা, নবিজির না'ত, মেরাজ এর ঘটনা এবং নিজের পিরমুর্শিদ খাজা ওবায়দুল্লাহ নকশবন্দি ও তখনকার সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। লাইলি ও মাজনূন এর বিশ্ববিখ্যাত প্রেমকাহিনীর বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে জামি আল্লাহ প্রেমের সুধা বিতরণ করেছেন। কিতাবের শেষভাগে রয়েছে আপন ছেলের প্রতি

কতিপয় মূল্যবান উপদেশ। রচনাকাল ৮৮৯ হিজরি। এর বেইত সংখ্যা ৩৭৬০। এ সম্পর্কে তিনি বলেন

کوتاهی این بلند بنیاد　　در هشصد و نه فتاد و هشتاد

ور تو بشمار آن بری دست　　باشد سه هزار و هشصد و شصت

সপ্তম মসনবি গ্রন্থ দেনামায়ে ইসকারি

নীতিশাস্ত্র ও চরিত্র সম্বন্ধীয় এই দ্বিপদী কাব্যটি কবি নিজমি ও কবি আমির খসরুর ইসকান্দার নামার আদলে লেখা। এর বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে তাওহিদ ও মুনাজাত, বার্ধক্য ও অসহায়ত্ব, সৈয়দুল মুরসালিন (স.) এর না'ত ও মে'রাজ প্রসঙ্গ, খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার এর জন্য দু'আ ও সুলতান হুসাইন বায়কারার প্রশংসা, আপন সন্তানের প্রতি উপদেশ, নিজের নফসের উদ্দেশ্যে নসিহত। ইসকান্দার এর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এরিস্টোটল, প্লেটো, সক্রেটিস, এবোক্রাট, এস্কিলিন্স, হুরমুস ও অন্যান্য মনীষীর উপদেশাবলি এবং ইসকান্দর ও অন্যান্যদের মাঝে জ্ঞান ও মনীষা বিষয়ক যে পত্রালাপ হয়েছে সেগুলোকে জামি তার এ কাব্যে বিন্যস্ত করেছেন। খেরদনামায়ে ইসকান্দরির রচনাকাল আনুমানিক ৮৯০ হিজরি। নিম্নের বেইতটি দিয়ে তিনি গ্রন্থটির রচনা শুরু করেন

الهي كمال الهی تراست　　جمال جهان پادشاهی تراست

বাহারিস্তান

শেখ সাদি (র) এর গুলিস্তানের আঙ্গিক ও অনুকীর্তিতে জামি এ কিতাবটি তার ছেলে জিয়াউদ্দিন ইউসুফ এর জন্য লিখেন। ১০ বছর বয়সে ছেলে যখন আরবি ভাষা-অলংকার ও সাহিত্য শিক্ষায় নিয়োজিত, তখন গদ্য ও পদ্যের আঙ্গিকে তিনি কিতাবটি রচনা করেন। গুলিস্তানের আদলে বাহারিস্তান আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং অধ্যায়গুলোর নামকরণ করেছেন 'রওয়া' নামে। ৮ রওযার বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে রওয়া-১ : আউলিয়ায়ে কেরাম ও সুফি বুজুর্গদের কাহিনী । রওয়া-২ মনীষীদের কথা। রওযা-৩ : রাজা-বাদশাহদের ন্যায় বিচার প্রসঙ্গ। রওযা-৪ : দয়া ও দান দক্ষিণা । রওযা-৫ : প্রেমের অবস্থাদির বর্ণনা । রওযা-৬: হাস্যরস। রওযা ৭ কবিদের অবস্থাদি। ও রওয়া-৮ : প্রাণীজগত সম্পর্কে বর্ণিত গল্প ও উপমাসমূহ। বাহারিস্তানের রচনাকাল ৮৯২ হিজরি। শুরুতে শেখ সাদির গুলিস্তানের অনুকীর্তির কথা তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন-

گذری کن بر این بهارستان　　تا ببینی در او گلستانها

در لطافت بهر گلستانی رسته گلها ،دمیده ریحانها

আর-রিসালাতুন নাইয়া

এই রেসালাটি নায় বা বাঁশরির হাকিকত সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ মওলানা রুমি (র) এর মসনবি শরীফের **১**ম বেইত এর ব্যাখ্যা। এটি 'নায়নামা' নামেও খ্যাত। পুস্তিকাটি শুরু করেছেন এভাবে,

عشق جز نانی و ما جز نی نئیم
او دمی بی ما و ما بی وی نئیم
نی که هردم نغمه آرائی کند
در حقیقت از دم نائی کند

রেসালা শরহে রুবাইয়াত

তাওহিদ, মহান আল্লাহ তাআলার যাত এর মারেফাত আর তার সৌন্দর্যের বিভিন্ন জলওয়ার সুফিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এই রেসালায়। ওয়াহদাতুল ওজুদ এর জটিল বিষয়াদির ব্যাখ্যায় কাবিতা অক্ষম হয়ে পড়ায় বুজুর্গানে দ্বীনের বিভিন্ন উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি গদ্যে কতক পরিভাষার ব্যাখ্যা দেন এবং তাতে নিজের ৪৪টি রুবাই ব্যাখ্যা করেন। একটি রুবাঈর নমুনা-

حمدا لاله هو بالحمد حقیق
در بحر نوالش همه ذرات غریق
تا کرده زمحض فضل توفیق رفیق
نسپرده طریق شکر او هیچ فریق

রেসালায়ে মুনশাআত

বিভিন্ন সময়ে লেখা মওলানা জামির চিঠিপত্র সংকলন এই রেসালা। এর পত্রগুলোকে বিষয়বস্তুর বিচারে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম. খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার প্রমূখ দরবেশগণের কাছে লেখা পত্রাবলি।

দ্বিতীয়. সুলতান হুসাইন বায়কারার কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে লেখা পত্রাবলি।

তৃতীয়. সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে লেখা পত্রসমূহ।

চুতর্থ. খোরাসানের বাইরের রাজা-বাদশাহদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিপত্র।

পঞ্চম. বিভিন্ন আমির, বন্ধুমহল, পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের কাছে লেখা বিচিত্র পত্রাবলি, তৎসঙ্গে রয়েছে কতিপয় সুপারিশনামা ও শোকবাণী।

পত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য হলো সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ, ছন্দোবদ্ধ ও শ্লোক-সজ্জিত। এসব চিঠি থেকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যাবলিও উদ্ধার করা যায়। এ ধরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি হচ্ছে সামারকান্দের প্রসিদ্ধ আলেম ও গুরকানি নতুন বর্ষপঞ্জি প্রণয়নে মির্জা উলগ বেগ এর সহযোগী কাজিজাদা সালাহ উদ্দিন মূসা ওরফে কাজিজাদা ক্রমির কাছে লেখা পত্র। জামি যৌবনে তার শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছিলেন।

দিওয়ানে কাসায়েদ ও গাযালিয়াত

মওলানা জামি (র) মোট তিনবার তার কাব্যগ্রন্থ দিওয়ান প্রণয়ন করেন। প্রথম দফা হিজরি ৮৮৪ সালে। দিওয়ানের প্রথম ভাগ ভূমিকার অংশে কবিতার সৌন্দর্য ও গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে কুরআন ও হাদীসের সাক্ষ্য-প্রমাণ; বিশেষ করে কবি ও কবিতার নিন্দায় বর্ণিত আয়াত ওহাদীস সমূহের ব্যাখ্যা আর কবি ও কবিতার প্রশংসায় হযরত রসুলুল্লাহ (স.) এর হাদীসের উদ্ধৃতি এনেছেন। এই গ্রন্থে তিনি তার কবিনাম জানা এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, জন্মস্থান বেলায়তে জাম ও শেখুল ইসলাম আহমদ জামির সমাধিস্থল এর সূত্রে- যার রূহানি তাওয়ালুহকে জামি তার কাব্য-প্রতিভার ঝর্ণা উৎস মনে করেন, তিনি 'জামি' কবিনাম ধারণ করেছেন শুরু করেছেন এভাবে-

بسم الله الرحمن الرحيم هست صلای سر خوان کریم

خوان کرم کرده کریم آشکار گوید بسم الله، دستی بیار

দ্বিতীয় পর্যায়ে, পরের বছর ৮৮৫ সালে তিনি আরেকটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেন। তাতে দিওয়ানটি সংকলনের কারণ ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে একটি ভূমিকা পেশ করেন। তার দু'টি পংক্তি-

بسم اله الرحمن الرحيم املی حمد المنان الکریم

آنکه باین نکته سنجیده گشت فاتحه آرای کلام قدیم

তৃতীয় পর্যায়ে, মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে ৮৯৬ হিজরিতে আপন কাব্যগ্রন্থকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করেন এবং একে তিনটি নামে ভাগ করেন। যেমন যৌবনকালে রচিত কবিতাসমূহ 'ফাতেহাতুশ শাবাব, দ্বিতীয় ভাগে জীবনের মধ্যভাগে রচিত কবিতাসমূহ 'ওয়াসেতাতুল আকদ' এবং শেষ জীবনের রচনাবলি 'খাতেমাতুল হায়াত'। এই নতুন বিন্যাস কবি আমির খসরু দেহলভির অনুকরণে এবং একান্ত শিষ্য ও বন্ধু প্রধানমন্ত্রী আমীর আলী শির নওয়ায়ির অনুরোধে সম্পন্ন করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। উপরোল্লিখিত তিনটি দিওয়ানের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে পাঁচ ধরনের কবিতা।

ক. কাসায়েদ; এর বিষয়বস্তু হচ্ছে তাওহিদ, নাতে রসূল (স), ইমামগণের প্রশংসা, আধ্যাত্মিক ও চরিত্র বিষয়ক বিষয়াদি, সমকালীন শাসকদের প্রশংসা ও শোকগাঁথা।

খ. মাসনবি ও তারজি কাব্য; এই অংশটি অপেক্ষাকৃত ছোট।

গ. মুকাত্তিয়াত; উপদেশ ও রসাত্মক বিভিন্ন উপদেশ সম্বলিত ছোট্ট কলেবরে এই অংশটি সাজানো।

ঘ. রুবাইয়াত; সুফিতাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম প্রেমতত্ত্ব বিধৃত হয়েছে এ রুবাইয়াত বা চতুষ্পদী অংশে।

ঙ. শরহে জামি : আরবি ব্যাকরণ 'নাহু' এর একটি উচ্চতর কিতাব। অর্থ জামির শরাহ। এটি আল্লামা ইবনে হাজেব রচিত গ্রন্থ 'কাফিয়া' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইবনে হাজেব, আল্লামা জামাল উদ্দিন আবু ওমর ওসমান ইবনে ওমর ইবনে আল হাজের আল কুরসী আন নাহভী আল মালেকী আল উসূলী আল ফকীহ। তিনি হিজরি ৫৭১ সালে জন্মলাভ করেন। কুর্দী বংশোদ্ভূত হলেও কায়রোতে জ্ঞানচর্চা করেন। তিনি ইসলামি জাহানের বিখ্যাত মুফতী ও ফকীহ এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি কিছুকাল দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং ৬৪৬ হিজরিতে আলেকজান্দ্রিয়ায় ইন্তেকাল করেন। আল্লামা ইবনে হাজেব ইসলামি জাহানের প্রসিদ্ধ আইন ও ব্যাকরণবিদ হিসেবে বিশেষভাবে খ্যাত। মওলানা জামির মৃত্যুর আনুমানিক এক বছর পূর্বে আরবি সাহিত্য অধ্যয়নরত নিজ সন্তান জিয়াউদ্দিন ইউসুফ এর উদ্দেশ্যে কিতাবটি রচনা করেন। রচনাকাল ৮৯৭ হিজরির ১১ রমযান, রচনার পর থেকে এই কিতাবটি ইসলামি জাহানের সর্বত্র মাদ্রাসার ছাত্র বিশেষতঃ আরবি ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ের ছাত্রদের মাঝে পাঠ্য হয়ে চলে আসছে। যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। আমাদের দেশের কওমি মাদ্রাসাসমূহে কিতাবটি এখনো পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ও বিপুলভাবে সমাদৃত। এতকাল ধরে কিতাবটি আরবি সাহিত্যের উচ্চতর পর্যায়ে সিলেবাসভূক্ত থাকা জামির অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কালজয়ী সাক্ষী।

কাসীদায়ে বুরদার তরজমা

ইসলামি জাহানে রাসুল (সা.)-এর প্রশস্তিমূলক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম কাসিদায়ে বুদা। মূল নাম "আল কাওয়াকেদ দুররিয়া ফি মাদহে খায়বিল বরিয়া' (সৃষ্টির সেরা মহামানবের প্রশংসায় সমুজ্জ্বল তারকারাজি), লেখক ইমাম শরফ আদ দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বুসিরি। স্বপ্নযোগে রাসূলে পাক (স.)-এর খেদমতে এই না'ত পাঠ ও খুশি হয়ে হযরত (স.)-এর গায়ের পবিত্র চাদর মোবারক উপহার দান আর তার ফলে কবির পক্ষাঘাত রোগ ভাল হয়ে যাওয়ার অলৌকিক ঘটনার জন্য এই কবিতাটির

খ্যাতি ইসলামি জাহানের প্রাচ্য প্রতীচ্য সর্বত্র। জামি (র.) অত্যন্তপ্রাঞ্জল ও সাবলিল ভাষায় ফারসি ভাষায় এ কবিতাটির অনুবাদ করেছেন। এই সুন্দর কাজটির একটি নমুনা-

কাসীদায়ে বুরদা

هو الحبيب الذى ترجى شفاعته لكل هول من الا هوال مفتهم

জামির (র.) তরজমা

آن حبیبی کو بود امیدگاه مؤمنان
از شفاعت نزد سختیهای پیچیده بهم

কাসীদায়ে বুরদা

فاق التبيين فى خلق و فى خلق ولم يدانوه فى علم و لا كرم

জামির (র.) তরজমা

بهترین پیغمبران در خلق و در خلق آمده
کس چو او شاید نه در علم و نه در وصف کرم

কাসীদায়ে বুরদা

غرفا من اليم او رشفا من الديم

জামির (র.) তরজমা

و کلهم من رسول الله ملتمس
عرفا من اليم او رشفا من الديم
ملتمس از وی همه از انبیا و از رسل
یک کف از دریای علم و شربتی رابرکرم

জামি (র.) রচিত কাফিয়া ইবনে হাজের বর্তমানে আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলোতে উচ্চতর আরবি ব্যাকরণ (নাহু) হিসেবে পাঠ্য।

জামির (র.) কবিতার বিষয়বস্তু

মওলানা আব্দুর রহমান জামি (র.) ছিলেন স্বভাব কবি। মহাকবি হাফিজ শিরাজির পর জামির মত আর কোনো বড় কবি এ পর্যন্ত ইরানের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন নি। এজন্যে তাকে বলা হয় খাতেমুন শোয়ারা, ফারসি ভাষায় সর্বশেষ কবিদের পরিসমাপ্তি। ফারসি কবিতার ৫টি প্রধান প্রকরণ হচ্ছে: কাসিদা, গজল, মসনবি, রুবাই ও কিতআ; কবিতার এই পাঁচটি ধারাতেই জামির কৃতিত্ব ও অবদান প্রশ্নাতীত। জামির কবিতার মূল প্রতিপাদ্য সুফিবাদ বা আধ্যাত্মিকতা এবং প্রেম ও মননশীলতা। কবিতার মত গদ্য সাহিত্যেও জামি দক্ষতার কালজয়ী স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে গবেষকদের মূল্যায়ণ হলো, কবিতার পাঁচটি ধারায় বিরাট অবদান সত্ত্বেও জামিকে এসব ধারার শীর্ষ কবিদের চাইতে শ্রেষ্ঠ অভিধায় অভিহিত করা যাবে না। আলী আসগর হিকমতের মূল্যায়নটি এক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য :

"কবিতার পাঁচটি ধারার কোনো একটিতেও জামিকে এই শাস্ত্রের অন্যান্য ওস্তাদদের চাইতে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেয়া যাবে না। যেমন আনোয়ারী ৯৯ ও মুইজজির ১০০ মতো কাসিদা রচয়িতা সাদি[২৯] ও হাফিজ[৩০] এবং এর মতে গজল গায়ক, খাজা আবু সাঈদ[৩১] খৈয়ামের[৩২] ও ইবনে সানায়ী[৩৩] এর মতো কেতআ লেখক কবিগণ। বরং বহুক্ষেত্রে তারা মতো করাই প্রণেতা জামির ওপর অগ্রগণ্যতার অধিকারী। কিন্তু যেখানেই সুফিতাত্ত্বিক পরিভাষা ও গবেষণার প্রসঙ্গ আসবে সেখানে দেখা যাবে যে, এই শাস্ত্রটি যেন একান্তজামির। অনুরূপ যেখানে হাদীস, রেওয়ায়াত ও আরবদের বিষয়াদির প্রসঙ্গ এসেছে তাতে ফারসিতে তরজমার ক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একই সাথে তরজমায় চূড়ান্ত পর্যায়ের আমানত রক্ষা করেছেন। তাতে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গটি খুব বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করলেও কোথাও আসল বিষয় ছাড়িয়ে যাননি। একইভাবে যেখানে তিনি ফারসিকবিতার মাঝে মাঝে আলাদাভাবে আরবি বেইত বা কেতআর উদ্ধৃতি এনেছেন, তাতে ভাষা শৈলীকে নতুন অলংকারে সজ্জিত করেছেন। আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তার অগাধ পাণ্ডিত্যই তাঁকে এক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী করেছে। যেমন তার আগে ও পরে ফারসিভাষী কবিদের মধ্যে যাঁরা আরবি কবিতা রচনা বা আরবি সাহিত্য হতে উদ্ধৃতি টানার চেষ্টা করেছেন,তারা জামির ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেন নি (হিকমত, ১৯৮৪: ২১১-২১২)।

জামি আজন্ম কবি, তার স্বভাবের সাথে কাব্যপ্রতিভা মেশা ছিল। এ কথাটি তিনি অত্যন্ত সাবলিল ভাষায় ভাষা ও অলংকারে সাজিয়ে তার দিওয়ানে কাসায়েদ ও গায়ালিয়াত কিতাবের ভূমিকায় স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেছেন।

উক্ত ভূমিকায় তিনি কুরআন মাজিদের আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে কবি ও কবিতার মর্যাদা সম্পর্কে সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। জামিকে খাতেমাতুশ শোয়ারা বা 'সর্বশেষ কবি' অভিধায় অভিহিত করার কারণ সম্বন্ধে আলী আসগর হিকমতের মত হচ্ছে প্রাচীন কবিদের ধারা অনুকরণে খোরাসান, ফার্স ও ইরাকে ফারসি কাব্যের যে রীতি চালু ছিল, জামির ইন্তেকালের মধ্যে দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং অন্তত হিজরি নবম শতকের শেষ লগনে তার ইন্তেকালের পর থেকে নিয়ে হিজরিএয়োদশ শতক পর্যন্তফারসি কাব্যের আকাশে সেরূপ উজ্জল নক্ষত্র আর জন্মগ্রহণ করে নি।

জামি নিজে স্বভাবগত কবি হলেও দুনিয়ার ভোগ লিপ্সার জন্য বা রাজা বাদশাহদের আনুকূল্য লাভ করে বস্তুগত সম্পদের অধিকারী হওয়ার জন্য কাব্যচর্চা করাকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। সিলসিলাতুয যাহাব ও তোহাফাতুল আহরারসহ অন্যান্য মসনবি কাব্যে তিনি এসব স্বার্থ শিকারী কবিদের নির্দয়ভাবে তিরস্কার করেছেন। এমনকি তার ছেলে জিয়াউদ্দিন ইউসুফকেও কাব্যচর্চার পেশা গ্রহণ থেকে নিরুৎসাহিত ও বারণ করেছেন ।

জামির কাব্য মানসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তিনি শীর্ষস্থানীয় কবি ও সাহিত্যিকদের রচনাবলি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেছেন এবং তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন। এমন কি ‘নাফাহাতুল উনস্' কিতাবে অধিকাংশ কবিদেরকে বুজুর্গ সুফি হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। শেখ সাদির গুলিস্তানের আদলে রচিত 'বাহারিস্তান' কিতাবেও একটি অধ্যায় বরাদ্দ করেছেন কবিদের জীবনচরিত আলোচনার জন্যে। তিনি সাদি, রুমি, হাফিজ, খাকানিপ্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছেন।

সামগ্রিকভাবে জামির কবি মানস আরবি সাহিত্য ও চিন্তাধারা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ও সিক্ত। জামির রচনায় আরবি ও ফারসির মিলন ও মিশ্রনের সুন্দর নমুনা হচ্ছে তার গজল কাব্য। ভাষাশৈলি ও অলংকারে এসব গজলকে আরবি ও ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

জামির নৈতিক শিক্ষামূলক কাসিদা ও ৭টি মসনবি কাব্যে আরবি সাহিত্য ও চিন্তাধারার প্রতিফলন উজ্জলভাবে দৃশ্যমান তিনি আরবি কবিদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মকে অতি সুন্দর, মার্জিত ও চমৎকার মননশীলতায় ফারসির পোষাক পরিয়ে সজ্জিত করেছেন। এ হিসেবে বলা যায় যে, শেখ সাদির পর জামিই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও কথাশিল্পী, যিনি আরবি সাহিত্যকে ফারসিতে সুন্দর সুষমায় ভাষান্তরিত করেছেন। জামি ‘সিলসিলাতুজ জাহাব' 'তোহফাতুল আহরার' ও 'সাবহাতুল আবরার' মসনবি কাব্যে কুরআন মাজিদের আয়াত, হাদীস শরীফ, বুজুর্গানে দ্বীনের বাণী, সুফিয়ায়ে কেরামের শিক্ষা ও আরবি সাহিত্যের উপমা উৎপ্রেক্ষা নানা কাহিনী অবলম্বনে ফারসির মিষ্টিভাষায় পরিবেশন করেছেন।

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে, আরবাঈনে জামি বা কারো চল্লিশ হাদীসের তরজমা, কুরআন মাজিদের সুন্দরতম কাহিনী সূরা ইউসুফের বর্ণনা-নির্ভর ইউসুফ-জুলাইখা দ্বিপদী কাব্য, দিওয়ানে কায়স আমিরী অবলম্বনে 'লাইলি মাজনুন', 'আগানী' অবলম্বনে কায়স এর কবিতা ও কাহিনীসমূহ অনুরূপভাবে ইসকান্দরনামায় ইরফান ও হিকমত (আধ্যাত্মিকতা) ও প্রজ্ঞান শাস্ত্রের বহু বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে যেগুলোর মূল সূত্র ও উৎস আরবি সাহিত্য।

জামির (র.) বোধবিশ্বাস ও আকিদা

মাওলানা আব্দুর রহমান জামির কবি মানস সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়ার নির্ভরযোগ্য পথ হচ্ছে তাঁর ধর্মীয় আকিদা বিশ্বাস ও অধ্যাত্মচেতনা সম্পর্কে জানা। জামির আকিদা বিশ্বাস সম্পর্কে একটি ছোট্ট পুস্তিকা রয়েছে তাঁর নিজের লেখা পদ্যে। খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার এর ছেলে জামিকে ইসলামি আকিদা সম্পর্কে সরল ও সঠিক বর্ণনা দেয়ার অনুরোধ জানালে তিনি 'সিলসিলাতুস জাহাব' কাব্যগ্রন্থ রচনার ফাঁকে এটি রচনা করেন এবং এর নামকরণ করেন 'এতেকাদনামা'। এটি সিলসিলাতুজজাহাব এর সংযুক্তি হিসেবে একত্রে মুদ্রিত। এতোদনামায় তিনি ৩০টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এগুলো হচ্ছে-

১. بيان وجود حق আল্লাহর অস্তিত্ব (ওজুদ)

২. بيان وحدت حق আল্লাহর এককত্ব

৩. اشاره به صفات الهى আল্লাহর গুণাবলি প্রসঙ্গ

৪. اشاره به حيات او আল্লাহর হায়াত প্রসঙ্গ

৫. اشاره به علم او আল্লাহর জ্ঞান প্রসঙ্গ

৬. اشاره به ارادت او আল্লাহর ইচ্ছা প্রসঙ্গ

৭. اشاره به كلام او আল্লাহর ক্ষমতা প্রসঙ্গ

৮. اشاره به سمع و بصر او আল্লাহর শ্রবণ ও দর্শন শক্তি প্রসঙ্গ

৯. اشاره به قدرت আল্লাহর কথা প্রসঙ্গ

১০. اشاره بافعال او আল্লাহর কার্যাবলি প্রসঙ্গ

১১. اشاره بوجود ملائكه ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব

১২. اشاره به ايمان انبيا নবি-রাসুলগণের ঈমান প্রসঙ্গ

১৩. اشاره به فضیلت نبی اسلام ইসলামের বীর ফজিলত (মর্যাদা)

১৪. اشاره به خاتمیت নবিজি (স.) সর্বশেষ নবি হওয়া প্রসঙ্গে

১৫. اشاره به شریعت او নবিজির (স.) শরিয়ত প্রসঙ্গে

১৬. اشاره به معراج او নবিজির (স.) মে'রাজ

১৭. اشاره به معجرات انبیاء রসুলগণের মু'জেযা

১৮. اشاره به کتابهای خدا আসমানী কিতাবসমূহ প্রসঙ্গ

১৯. اشارت به اینکه کتاب الله قدیم است আল্লাহর কিতাব অনাদি হওয়া প্রসঙ্গ

২০. اشارت به فضیلت امت و اشرفیت آل و اصحاب উম্মতে মুহাম্মদীর মর্যাদা এবং নবিজির আহলে বাইত ও সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গ

২১. اشارت به اینکه تکفیر اهل قبله جایز نیست যারা কেবলা মানে তাদেরকে কাফের বলা জায়েজ না হওয়া প্রসঙ্গ

২২. اشارت به عذاب قبر و سؤال منکر و نکیر কবর আযাব ও মুনকির নকির এর সওয়াল জওয়ার প্রসঙ্গে

২৩. اشارت به نفختین সিংগায় দুই ফুঁক প্রসঙ্গ

২৪. اشارت به تطائرصحائف আমলনামা প্রসঙ্গ।

২৫. اشارت به میزان এ দাঁড়িপাল্লা প্রসঙ্গ

২৬. اشارت به صراط পুলসিরাত প্রসঙ্গ

২৭. اشارت به مواقف عرصات কিয়ামতের ময়দানের বিভিন্ন অবস্থান প্রসঙ্গে

২৮. اشارت به خلود کفار در نار و خروج بعضی بشفاعت
কাফেররা চিরন্তন দোজখে যাওয়া ও কিছুলোক শাফায়াতের কারণে দোজখ হতে মুক্তিলাভ প্রসঙ্গে

২৯. اشارت به حوض کوثر এস এর হাউজে কাওসার প্রসঙ্গে

৩০. اشارت بدرجات بهشت و خلود آن و رؤیت حق سبحانه و تعالی বেহেশতের বিভিন্ন স্তর ও চিরন্তন জীবন এবং আল্লাহ তাআলার দর্শনলাভ প্রসঙ্গ।

মওলানা জামি সিলসিলাতুজ জাহার প্রথম দফতরের শুরুতেও কবিতায় তাঁর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকআকিদা বিশ্বাস বর্ণনা করেছেন। তিনি কালাম শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে বহুল আলোচিত জবর

(নিয়তির বাধ্যতা) ও এখতেয়ার (কর্মের স্বাধীনতা) প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং তাতে 'আশায়িরা' মতবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

জামির বোধ-বিশ্বাস সম্পর্কিত আরেকটি গ্রন্থ 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত'। কিতাবটি রাসুল (স.) এর প্রেমে আকীর্ণ। এছাড়া তাতে আহলে বাইত (রাসূলে পাক (স.) এর বংশধর) সম্পর্কে ভুয়সী প্রশংসার কারণে কোনো কোনো শিয়া গবেষক তাকে মনের দিক থেকে শিয়া আকিদায় বিশ্বাসী বলে দাবি করেছেন। কিন্তু তিনি যেভাবে ইসলামের প্রথম চার খলিফার প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে ইসলামের চারটি মূল স্তম্ভ বলে বর্ণনা করেছেন আর বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী তথা আশারা মুবাশশরা ও অন্যান্য সাহাবীদের প্রশংসা করছেন তাতে তাঁকে শিয়া বলার কোনো যুক্তি নাই। আসল কথা হলো তিনি একজন সত্যিকার সুন্নি। যিনি আহলে বাইতে ইমামগণের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তেমনি খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা নয় বরং তাদেরকে ঈমান ও ইসলামের প্রতিভূ ও অনুসরণীয় বলে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। মূলত সুন্নি সমাজের মধ্যে চার খলিফা, আশারা মুবাশশরাসহ আহলে বাইতের প্রতি যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ঐতিহ্য গড়ে ওঠেছে নিঃসন্দেহে তার পরিগঠনে জামির এই কিতাবটির বিরাট অবদান রয়েছে। তাতে সাবাহায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণে সংকীর্ণতা বা বাড়াবাড়ির মাঝামাঝি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর বোধ বিশ্বাস স্থাপনে জামির এই অবদান অসাধারণ ।

তৃতীয় অধ্যায়

আব্দুর রহমান জামির (র.) কবিতায় রাসুল (স.)-এর প্রশংসা

আব্দুর রহমান জামির (র.) কবিতায় রাসুল (স.)-এর প্রশংসা

মওলানা আব্দুর রহমান জামি (র.)-এর কবিতা ও সাহিত্যচর্চার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাসুল (স.)-এর প্রশংসা। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিকরা; বিশেষ করে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশস্তি গেয়েছেন সরায় কণ্ঠে। কোনো কোনো কবি হযরতের (স.) প্রশংসায় নিজের কাব্যপ্রতিভা সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে বাংলার সুফি ও ফারসি কবি ফতেহ আলী শাহ এর নাম প্রাতঃস্মরণীয়। ইরানি কবিদের মধ্যে যারা ব্যাপক ও বিস্তৃত আকারে রাসুল (স.)-এর প্রশস্তি গেয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছেন মওলানা আব্দুর রহমান জামি (র.)। তিনি তার মসনবি কাব্য 'হাফত আওরাঙ্গ' ও গয়লকাব্য 'দিওয়ানে গাযালিয়াতে' বারেবারে বিভিন্ন ভাষা ও ভঙ্গিতে রাসূলে পাক (স.)-এর প্রশংসা করেছেন। তাঁর এসব কবিতা ও গযল ইরানের গণ্ডি পেরিয়ে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র; বিশেষ করে উপমহাদেশে ব্যাপক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশে ফারসি ভাষা অফিস-আদালতের ভাষার মর্যাদা হারিয়েছে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে। ১১ এরপর সরকারি আলীয়া নেসাবের মাদ্রাসাগুলোর সিলেবাস হতেও বিদায় নিয়েছে পাকিস্তান আমলে। কওমি মাদ্রাসাগুলোতেও ফারসিরচর্চা এখন সীমিত। এতদসত্ত্বেও জামি রচিত কিছু কিছু না'ত রাসূলে পাকের (স.) ভক্ত উম্মতদের প্রাণ জুড়ায়। ধর্মীয় মাহফিলে বা কাওয়ালদের সুরের ঝংকারে জামির এসব না'ত পঠিত হলে অর্থ না বুঝেও ভক্ত-হৃদয় বিগলিত হয় তার ছন্দের আকর্ষণে, রাসুল (স.)-এর প্রেমের অতিশয্যে। এ ধরণের কয়েকটি না'তের প্রথম কলি এরূপ:

زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول الله
غریبم بی نوایم خاکسارم یا رسول الله

"যে রাহমাত কুন নায়ার বার হালে যারাম ইয়া রসূলাল্লাহ!
গারিবাম! বে নওয়ায়াম খাকসারাম ইয়া রসূলাল্লাহ (নদভী, ২০০২: ৯১)।
"আপনার দয়া রহমতের নেক নজরে আমার অসহায়
অবস্থার দিকে একবার দৃষ্টি দিন- ইয়া রাসুলাল্লাহ!
কারণ আমি গরীব নিঃস্ব ধুলায় লুণ্ঠিত, আপনার
দয়ার প্রত্যাশী আমি কাঙ্গাল, ইয়া রসূলাল্লাহ।"

আরেকটি না'তের কলি

و صل الله علی نور گزو شد نورها پیدا
زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا

"ওয়া সাল্লাল্লাহ্ আলা নূরিনকে শুদ নূরহা-পেয়দা
যামিন আয় হুববে ও সাকিন ফালাক দার ইশকে উ শেয়দা (নদভী, ২০০২: ৩৫)
আল্লাহর বহুমত অবারিত হোক সেই নূরের উপর
যাঁর নূর থেকে পয়দা সৃষ্টির অগণিত নূর।
পৃথিবী তাঁর ভালবাসায় আপ্লুত স্থিত
আকাশ তাঁর প্রেমে উন্মাতাল ঘূর্ণনরত।"

এই না'তটির পূর্ণ বিবরণ এ অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্ট-২ এ উল্লেখ করা হয়েছে। অপূর্ব সুর-ঝংকার সমৃদ্ধ আরেকটি না'ত

گل از رخت آموخته نازک بدنی را، بدنی را، بدنی را
بلبل زتی آموخته شیرین سخنی را، سخنی را ، سخنی را

'গুল আয রূখাত আ'মুখতে নাযুক বাদানি রা, বাদানি রা, বাদানি রা
বুলবুল যে তূ আ'মূখতে শিরিন সুখানি রা, সুখানি রা, সুখানি রা।

"ফুল তোমার চেহারা থেকে পেয়েছে কোমলতা, দেহের কমনীয়তা
তোমর কণ্ঠ হতে পেয়েছে বুলবুলি কণ্ঠের মোহিনী মাধুরী সুরেলা।"

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম জামির এই না'ত অবলম্বনেই মধুর কণ্ঠে গেয়েছেন সেই বিখ্যাত না'ত মুহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগেতাই তো এর কণ্ঠের এ গান এত মধুর লাগে... (ইসলাম, ১৯৮৪: ৪৭৭)। কবিতার মত গদ্যেও জামি রাসুল (স.) প্রশস্তির এক অনবদ্য মহাকাব্য রচনা করেছেন। তাঁর এই অমর গ্রন্থের নাম 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত'- (নবুয়াতের প্রমাণপঞ্জি)। এখানে জামির কবিতা ও গদ্য রচনা হতে তাঁর রাসুল (স.) প্রশস্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য পেশ করা হলো

সৃষ্টির মূল নবিজি (স.)

মওলানা আব্দুর রহমান জামি (র) তাঁর রচনাবলির সর্বত্র হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় যে বিষয়টির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো, হাদীসে কুদসি হিসেবে প্রসিদ্ধ একটি ভাষ্য:

لو لاک لما خلقت الافلاک

হে নবি! যদি আপনাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য না হত তাহলে এই সৃষ্টিজগৎ আমি সৃষ্টি করতাম না।' এই অর্থে জামির ভাষায় নবিজি (স.) হলেন 'শাহে লাও লাক'।[৩৪] নবিজি (স.) মানবকুলের হেদায়াতকারী ও সহায়তাকারী হিসেবে গোটা সৃষ্টির পথ প্রদর্শক-'কায়েদুল খালক' (জামি, ১৯৮৭: ৯-১০)। জামি অন্য একটি হাদিসও এ বিষয়ে উল্লখ করেন,

قاید الخلق بالهدی و العون شاه لو لاک ما خلقت الکون

نقد یثرب سلالهٔ بطحا امی لوح خوان ما اوحی

নিরক্ষতার মাহাত্ম

জামি (র) নবিজিকে (স.) উম্মি নবি বা নিরক্ষর পয়গাম্বর হিসেবে অতি-মানবিয় গুণাবলীর আধার রূপে দেখেছেন। জামির ভাষায় নবিজি (স.) উম্মি ছিলেন বটে, কিন্তু 'মা আওহা' বা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত ওহির ভাণ্ডার ধারণ করার অলৌকিক ফলক ছিল হযরতের (স.) হৃদয়। আল্লাহর সন্নিধানে সংরক্ষিত উম্মুল কিতাবের ফয়েজ ও জ্ঞানরশ্মিতে উদ্ভাসিত ছিলেন তিনি। স্বয়ং আল্লাহই উম্মি বা নিরক্ষর অভিধায় নবিজির (স.) প্রশংসা করেছেন (আল কুরআন, ৭: ১৫৭)। তিনি হাতে কলম ধারণ করেন নি বা লেখার স্লেট হাতে নেননি বটে; কিন্তু আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত ফলক ও কলম ছিল তাঁর হাতের মুঠোয়। যিনি কলম সদৃশ অঙ্গুলির ইশারায় চাঁদ দু'টুকরা করেন (জামি, ...: ৯-১০)। কাজেই তিনি যদি কলম দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ নাও করেন তাতে দোষের কি আছে?

فیض ام الکتاب پرورش لقب امی خدای از آن کردش

قلم لوح بودس اندر مست زان نفر سودش از قلم انگشت

তাঁর অবয়বে কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহ প্রতিবিম্বিত

জামি (র) প্রেম ও ভালবাসার দৃষ্টিতে রাসূলে পাক (স.)-কে যখন দেখেছেন তখন তাঁর মধ্যে কুরআন মাজিদের বিভিন্ন আয়াতের প্রতিবিম্ব ও প্রতিফলন দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। তাঁর কবি মানসে কুরআনের সূচনা হয়েছে মুহাম্মদ (স.)-এর নাম দিয়ে। যেমন প্রথম সূরা ফাতিহার সূচনা হয়েছে আলহামদু দিয়ে। তার পরের সূরার সূচনা হয়েছে আলিফ লাম মীম এর সাহায্যে জামি বলতে চান যে, এর মর্মার্থ হচ্ছে আলিফ লামকে মীম দ্বারা বদল করা। কাজেই আলহামদু এর আলিফ লাম বা 'আল'কে মীম ধারা বদল করলে তা হয়ে যায় মুহাম্মদ। এই মুহাম্মদই কুরআনের সারমর্ম। সৃষ্টিজগতের সকল রহস্যের আধার। তাঁর প্রাণ হচ্ছে ইলম ও একীন, জ্ঞান ও প্রত্যয়ের ভাণ্ডার । এ কারণেই হযরত আয়েশা (র.) বলেছেন যে, তাঁর চরিত্র-সুষমা ছিল হুবহু কুরআন। কুম ফা আনযির' (আল কুরআন ৭৪:২) হচ্ছে তাঁর সুন্দর গড়নের রহস্য। ফাসতাকিম ১২২-তাঁর অবিচলতার প্রতীক। তাঁর চেহারার দীপ্তিতে ওয়াদ্দোহা দেদিপ্যমান। তাঁর হৃদয়ের প্রসারতায়-আলাম নাশরাহ এর রহস্যগাথা বিবৃত। তাঁর চক্ষু সৌন্দর্যমণ্ডিত আর তাঁর দৃষ্টির মাঝে প্রখরতা দেদিপ্যমান। পরিশেষে তিনি শত সহস্র সালাম ও দরুদ নিবেদন করেছেন রাসূলে পাক (স.)-এর পবিত্র চরণতলে (জামি, ১৯৮৭: ৯-১৯)।

بود هم بحر مكرمت هم كان　　گوهرش كان خلقه القرآن
كمل ما زاغ سرمة بصرش　　ماطغي وصف پاكى نظرش
وعلى آله و اصحابه　　وارثى علمه و آدابه

নবিজির (স.) পায়ের ধুলোকে চোখের সুরমা করার আকুতি

'সিলসিলাতুজ জাহাব' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে আল্লাহ তাআলার হামদের পর একটি দীর্ঘ না'তে জামি (র)-র প্রাণের আর্তি আকুতি ফুটে ওঠেছে মদিনার ধুলোবালিতে গড়াগড়ি যাবার জন্যে। নবিজির (স.) পায়ের পাদুকার ধুলি যেন জামির চোখের সুরমায় পরিণত হয়। তাঁর জন্য জামির ব্যাকুলতা কোনো সীমারেখা মানে না। জামির ভাষায় 'আমার প্রাণ ও চোখ দু'টি আপনার পাদুকার ধুলায় ধুসরিত হোক।' আমার হৃদপিণ্ডের সাথে যুক্ত রগগুলো হোকআপনার পাদুকার ফিতা। জামি বলেন: হে প্রিয় রাসুল (স.)! আপনি যেদিকেই পদচারণা করেন বসন্ত বায়ুর মতো সেখান থেকে মেশক আম্বরের সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। নবিজির (স.) রওজার আঙ্গিনা মনে হয় কা'বার মত। পাপমুক্তি ও হৃদয়ের সূচিতার হেরেম মদিনার রওজার মাটি। নবিজির (স.) কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান সত্যিকার অর্থেই বেহেশতের টুকরা। প্রেমের অতিশয্যে জামি অস্থির বেকারার। রওজার সম্মুখে তিনি আত্মহারা আর্তনাদ করেন:

আপনার খেদমতে সালাম জানাতে এসেছি, দয়া করে আমার সালামের জবাব দিন। দুঃখ ভারাক্রান্ত আমার তাপিত হৃদয়ে শান্তির বারি বর্ষণ করুন। ইয়ামেনি চাদর গায়ে আপনি শুয়ে আছেন। দয়া করে কোম হাতখানা বের করে দিন। যেন এই আত্মহারা পরম শান্তি লাভ করতে পারি। আপনি আমার কান্না শুনুন। মুখের কোণে একটু হাসুন। একটু কথা বলুন। আপনার পদতলেপ্রাণ বিসর্জন দিতে পারা আমার জন্য সৌভাগ্য। কারণ, আপনার পায়ের ধুলি নিয়ে আরশও হয়েছে ধন্য। আমি গোনাহগার হলেও আপনার উম্মত। এই দাবী, এই আবদার নিয়ে আমি আপনার পদধুলি পেতে চাই। ৪২টি শ্লোকের এই দীর্ঘ না'তটি নিঃসন্দেহে জামির রাসুল (স.) প্রেমের অনবদ্য ব্যঞ্জনা। নাতটির শিরোনাম 'দার খেতাবে জামিন বুঝে হাযরাতিকে নাকশে খাতমে নাবুওয়াতাশ।

در خطاب زمین بوس حضرتی که نقش خاتم نبوتش خاتم النبیین است و طراز خلعت رسالتش سید المرسلین علیه من الصلوات از کاها و من التحیات انماها.

নবিজির (স.) শ্রেষ্ঠত্ব

আমাদের প্রিয়নবি (স.) সকল নবি রাসূলের (আ.) শিরোমণি-এ বিষয়ে জামির বহু কবিতায় ইঙ্গিত ও বর্ণনা রয়েছে। 'সিলসিলাতুজ জাহাব' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সূচনায়ও জার্মি বিষয়টি খুব সংক্ষেপে অথচ সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। জামির ভাষায় আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের অনিবার্য দাবি হচ্ছে, কেউ কেউ অন্য কারো তুলনায় অধিক উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ হবেন। সেই সূত্রে আমাদের নবি আহমদ আরাবি (স.) সকল নবি রসূলগণের শিরোমণি। সকল নবিদের মাঝে যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সবগুলো একত্রিত করলেও আমাদের প্রিয় নবির গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমানহবে না। অন্যান্য নবিদেরকে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় ও জাতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু একমাত্র আমাদের নবিই সকল মানব গোষ্ঠীর কাছে প্রেরিত হয়েছেন।

هست بر مقتضای فصل ازل　　بعضی از بعضی افضل و اکمل
آن فضایل که انبیا را بود　　و آن شمایل که اصفیا را بود
گر شود جمله مجتمع باشد　　همه باشد ز فصل احمد کم

তিনি সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষ

জামির মতে প্রিয় নবিজি (স.) একইভাবে সর্বশেষ নবি ও রাসুল । তাঁর মতে তিনি সমগ্র, অন্যরা তাঁর অংশ। তাঁর পরে কোন নবি আসবেন না। এমনকি শেষ জমানায় যখন ঈসা (আ.) আসমান থেকে

পৃথিবীতে নেমে আসবেন তখন তিনি যদিও আগে নবি ছিলেন, কিন্তু অবতরণের নবিজির (স.) শরীয়তের অনুগামী ও অনুসারী হবেন। ঈসা (আ.) মানুষকে যখন আল্লাহর পথে আহ্বান করবেন তখন শেষ নবির (স.) খান ও আদর্শের দিকেই আহ্বান করবেন।

خاتم الانبياء والرسل است دیگران همچو جزء و او چوکل است
چو در آخر زمان بقول رسول کند از آسمان مسیح نزوک
پی رو دین و شرح او باشد تابع اصل و فرع او باشد

নবিজির (স.) মি'রাজ প্রসঙ্গ

নবিজির মি'রাজ সকল সুফি-কবিদের অভিন্ন বিষয়বস্তু। মাওলানা আব্দুর রহমান জামিও মিরাজের প্রশংসায় বহু কবিতা রচনা করেছেন মনের মাধুরি মিশিয়ে। সিলসিলাতুজজাহাব কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনাতে এ সম্পর্কিত একটি কবিতার শিরোনাম ইশারাতুন ইলামিঃ রাজিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এতে মি'রাজ এর ধারাভাষ্যটি খুব সাদামাটা ভাষায় এভাবে ফুটে উঠেছে।

এক রাতে আল্লাহ নবিজিকে (স.) নিয়ে যান। বাতহা (মক্কা)-র মাটিতে তিনি জাগ্রত হন। নিয়ে যাওয়া হয় মসজিদুল আকসায় (ফিলিস্তিনে)। তাঁর বাহন ছিল বিদ্যুৎ গতির বোরাক। সেখান থেকে একেক করে সাত আসমান পাড়ি দেন। যাবার পথে আগেকার সকল নবিদের (আ.) সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি বেহেশত পরিদর্শন করেন, দোযখও দেখেন। উভয়ের বাসিন্দাদের পরিদর্শন করেন। সাত আসমান পাড়ি দেয়ার পর সফরসঙ্গী ফেরেশতা জিব্রাইল (আ.) সিদরাতুল মুন্তাহায় থেমে যান। সেখান থেকে নবিজি (স.) একাকী রওয়ানা হন। রবরব তাঁর নতুন বাহন। আরো উর্ধ্বে আরো সম্মানিত এক আকর্ষণীয় স্থানে। সেই স্থান (মাকান) আসলে 'লা মাকান' আল্লাহ ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব নাই সেই অগম্যলোকে। সেখানে তিনি দেখেন যা দেখবার ছিল এবং শুনেন যা শুনবার ছিল। সেই অলৌকিক সফর শেষে পুনরায় ফিরে আসেন পৃথিবীতে আপন আবাসে । দেখেন যে, তাঁর বিছানার উষ্ণতা তখনও অক্ষত আছে।

برد بیدار حق شب از بطحا
بتن او را بمسجد اقصی
دیدنیها بدید آنچه بدید
و آنچه بود از شنیدنی بشنید
روی از آنجا بجای خویش آورد

خوابگاهش هنوز ناشده سرد

নবিজির (স.) বিভিন্ন মুজিজা প্রসঙ্গে

রাসূলে পাক (স.)-এর প্রশংসায় রচিত মাওলানা জামির গল্পসমূহের বিষয়বস্তুর প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে নবিজির (স.) মুজিজা বা অলৌকিক ঘটনাসমূহের ইঙ্গিতমূলক আলোচনা। তিনি তার 'তোহফাতুল আহরার' কাব্যের শুরুতে একটি নাতে হযরতের (স.) প্রায় সবগুলো অলৌকিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ২৭নং শ্লোকের গজলটির শিরোনাম :

بعضی معجزات وی که از حد و متجاوزست و نطاق نطق از احاطه بآن عاجز صلی الله علیه و سلم

'হযরতের (স.) কতিপয় মুজিজা; যেগুলো সীমা-সংখ্যাহীন এবং বাক্যের বাঁধনে আবদ্ধ করা অসম্ভব, সেগুলো সম্পর্কিত না'ত (জামি, ১৯৮৭: ৩৭৯)।

জামি রাসূলে পাক (স.)- কে সম্বোধন করে বলেন যে, আপনার আঙ্গুল ইশারায় চাঁদ দুই টুকরা হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, চাঁদ আপনার আজ্ঞাবহ।

আপনার নবুয়তের প্রাসাদ বুলন্দ হবার সাথে সাথে কিসরা বা পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের রাজ প্রাসাদে ফাটল সৃষ্টি হয়। আপনার চলার পথে মেঘখণ্ড ছাতা হয়ে আপনার ওপর ছায়া বিস্তার করে।

মাটির ওপরে কেউ কোনো দিন আপনার ছায়া দেখেনি। কারণ আপনার দেহসত্তা ছিল নূর জ্যোতির্ময়। কাজেই সূর্যের আলো আপনার কাছে এসে নিস্প্রভ হয়ে যায়।

মাওলানা জামি আরো বলেন, আপনার চোখ দু'টি সামনে ছিল; কিন্তু সামনে পেছনে সব সমান দেখতেন আপনি। আসলে গোটা জগতই যেন আপনার সম্মুখবর্তী ছিল। আপনি প্রাণসত্তা। তাই কোনো কিছুই আপনার দৃষ্টির আড়ালে নয়।

শুষ্ক কঠিন পাথর আপনার হাতের মুঠোয় কথা বলে। তাতে কঠিন হৃদয় কাফেররা দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়। আপনার হাতের আঙ্গুল হতে ঝর্ণার মত পানি প্রগ্রবণ প্রবাহিত হয়। হাজারো ক্ষুধার্ত তৃষিত মানুষ সে পানি পিয়ে তৃপ্ত হয়।

খেজুর বৃক্ষ মাটির সাথে প্রোথিত শক্ত নিথর। অথচ আপনার ইশারার আদেশ পেয়ে সে বৃক্ষ চলে আসে সচল হয়ে। আপনি যেখানে যেতে বলেন সেখানেই যায়, যেখানে থামতে বলেন সেখানে থেমে যায় ।

জামি হিজরতের সময় রসূলুল্লাহ (স.) পথিমধ্যে গারে সৌরে (সৌর গুহা) আশ্রয় নিলে পরক্ষণে সেই গুহার মুখে মাকড়শা জাল বোনা এবং কবুতর এসে পাশে বাসা বেঁধে ডিম পাড়ার অলৌকিক ঘটনার স্মৃতিচারণ করেন। তারপরে জনৈক ইহুদী মহিলা খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করলে গলধকরণ করার পূর্বক্ষণে ভুনা বকরির গোশতের 'আমার সাথে বিষ মিশ্রিত, আমাকে খাবেন না। হযরত' বলে আর্তনাদকেও হযরতের শ্রেষ্ঠ মুজিজা বলে উল্লেখ করেন।

সবশেষে হিজরতে রওনা হবার সময় আল বদর যুদ্ধের রণাঙ্গণে কাফেরদের দিকে বালি নিক্ষেপ করার যে ঘটনা কুরআন মাজিদে বর্ণিত তার উল্লেখ করে নবিজির (স.) পরশ পাওয়ার আর্তি পেশ করেন (আল কুরআন, ৮ : ১৭)।

ای زنو شق شقه ماه منیر
پیش تو مهر آمده فرمان پذیر
چتر فرازنده فرقت سحاب
سایه نشین چتر تر اسب نخل که
نخل که بودش بز مین سخت پای
جست بفرموده امرت زجای

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত লাভের জন্য প্রাণকাড়া আকুতি

মওলানা আব্দুর রহমান জামি (র)-এর হাফত আওরাঙ্গ কাব্য সমগ্রের অন্যতম কাব্যগ্রন্থের নাম ‘ইউসুফ জুলাইখা (হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি জুলাইখার প্রেম আলেখ্য)। এই কাহিনীর অন্তরালে জামি মূলত: আল্লাহর প্রেমের মাধুরী বিলিয়েছেন। কাব্যগ্রন্থের সূচনায় আল্লাহর প্রশংসা বা হামদের পর তিনটি সুদীর্ঘ দ্বিপদী কবিতা রচনা করেছেন নবিজির (স.) প্রশংসায়। প্রথম কবিতাটি রাসূলে পাকের (স.) প্রশংসায় নিবেদিত। দ্বিতীয় কবিতাটি রাসূলে আকরাম (স.)-এর মিরাজ গমনের ঘটনাবলীর বর্ণনা সম্পর্কিত। আর তৃতীয় কবিতাটি হযরতের শাফায়াত লাভ ও মদিনায় রওজায় হাজির হয়ে সালামের জবাব পাবার হৃদয়কাড়া আকুতি সম্পর্কিত। এই কবিতাকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনা আমাদের ধর্মীয় মহলে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন কোনো গ্রন্থসূত্রে ঘটনাটির অকাট্যতা প্রমাণিত না হলেও সুফিয়ায়ে কেরাম ও আলেমদের মহলে এ ঘটনার মৌখিক বর্ণনা পরম্পরা সন্দেহাতীত। উপমহাদেশে ঘটনাটির খ্যাতির পেছনে একটি তথ্যসূত্র পাওয়া যায় । সেই সূত্র থেকে ঘটনাটি উল্লেখ করা হলো। ঘটনার মাহাত্ম ও মহিমার কারণে এই কবিতাটি উচ্চারণ ও অনুবাদসহ পেশ করা হলো। কবিতাটির শিরোনাম লেবাসে জারাআত পুশিদান...

لباس ضراعت پوشیدن و در اقتباس نور شفاعت کوشیدن

‘জীর্ণশীর্ণ পোশাক পরিধান এবং শাফায়াতের নূর চয়ন করার চেষ্টা (জামি, ১৯৮৭: ৩৭৯)।

জীর্ণশীর্ণ পোষাক পরিধান এবং শাফায়াতের নূর আহরণের চেষ্টা

কবিতাটি 'সিলসিলাতুজ জাহার' কাব্য সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত 'ইউসুফ-জুলাইখা' কাব্যগ্রন্থের শুরুর দিকের একটি না'ত। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মওলানা জামির ইচ্ছা ছিল হজ সম্পন্ন করার পর মক্কা হতে মদীনায় যাবেন এবং রওজায়ে আকদাসের কাছে দাঁড়িয়ে মনের আকুতি উজাড়করে এই নাতটি সরওয়ারে কায়েনাত এর দরবারে হাদীয়া হিসেবে বিনয়াবনত মস্তকে পাঠ করবেন। কিন্তু মক্কা হতে রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে মক্কার শাসক স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলে পাক (স.) তাঁকে আদেশ দিচ্ছেন, আব্দুর রহমান জামি আমার জিয়ারতের জন্যে আসতে চাচ্ছে। তাকে আসতে দিও না। জামি (র.) বাধাগ্রস্ত হয়ে পুনরায় গোপনে রওয়ানা হবার চেষ্টা করেন। এবারও মক্কার গভর্ণর একই রূপ স্বপ্নে দেখেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে আটক করে জেলে দেয়া হয়। রাসূলে পাক (স.) আবার স্বপ্নে দেখান যে, জামির প্রতি তোমরা রূঢ় ব্যবহার করো না। সে কোনো অপরাধী নয়; বরং তাঁর ইচ্ছা ছিল আমার জিয়ারতে আসবে এবং আমার সম্মুখে তাঁর একটি না'ত পড়ে শোনাবে। তখন না'ত এর হৃদয় কাড়া টানে আমাকে আল্লাহর শাশ্বত বিধান ভঙ্গ করে হাত বের করে দিয়ে সাক্ষাত প্রার্থীর সাথে হাত মেলাতে হত। তাই তাকে আসতে বাধা দেয়ার জন্য বলেছি। এই স্বপ্নের পর মক্কার শাসক জামরি প্রতি সদয় ও সশ্রদ্ধ আচরণ করেন। এই দীর্ঘ ফারসি না'তটির কাঁচা হাতের অনুবাদ পেশ করার দুঃসাহস দেখানো হলো।

زمهجوری بر آمد جان عالم ترحم یا نبی الله ترحم

আপনার বিরহে জগতের প্রাণ ওষ্ঠাগত

দয়া কর হে আল্লাহর নবি! অনুগ্রহ দেখাও।

ز نه آخر رحمة للعالميني

ز محر و مان چرا فارغ نشینی

আপনি কি জগতসমূহের রহমত নন?

বঞ্চিতদের তাহলে কিভাবে ভুলে থাকবেন ?

زخاک ای لاله سیراب برخیز چو نرگس خواب چند از خواب برخیز

মাটির বুক চিরে হে টিউলিপ! উঠুন আপন সজিবতায়

নার্গিস ফুলের মত ঘুম আর কতকাল? জাগ্রত হোন।

برون آور سر از برد یمانی که روی تست صبح زندگانی

আপনার শির মোবারক বের করুন ইয়ামেনি চাদর সরিয়ে

কেননা আপনার চেহারার দর্শন যে জীবনের প্রভাত ।

شب اندوه ما را روز گردان رویت روز ما فیروز گردان

আমাদের দুশ্চিন্তার রজনীকে বদলে দিন দিবসে

আপনার চেহারার ঝলকে আমাদের জীবন হোক উজালা

بتن در پوش عنبر بوی جامه
بسر بر بند کافوری عمامه

আপনার গায়ে পরিধান করুন মেশকে আম্বরে সুরভিত জামা।

আপনার মাথায় বাঁধুন কর্পূর-সুবাসিত পাগড়ি

فرو آویز از سر گیسوان را فگن سایه بیا سرو روان

আপনার শির মোবারক হতে ছেড়েদিন মায়াবী অলকগুচ্ছ

চলন্ত দেবদারু তুল্য সুদর্শন শরীরের ছায়া বিস্তার হোক তাতে।

হযরতের (স.) সদয় পদচারণার আকুতি জানিয়ে জামি (র.) আরো বলেন-

ادیم طایفی نعلین پا کن شراک از رشته جانهای ما کن

আপনার পায়ে দিন তায়েফি চামড়া নির্মিত পাদুকা

আমাদের হৃদপিণ্ডের রগগুলো হোক সে পাদুকার ফিতা।

جهانی دیده کرده فرش راهند چو فرش اقبال پا بوس تو خواهند

আপনার আগমন প্রত্যাশায় গোটা জগত দৃষ্টি বিছিয়েছে ফারাশ রূপে

আপনার পদচুম্বন করে ধন্য হবার প্রতীক্ষায় অধীর জগৎ।

زحجره پای در صحن حرم نه بفرق خاک ره بوسان قدم نه

দয়া করে হুজরা হতে পা মোবারক হেরেমের আঙ্গিনায় রাখুন

আপনার গলির ধুলি চুমে চুমে যারা এসেছে তাদের তুলির ওপরে রাখুন।

بده دستی زیا افتادگان را بکن دلداری دل داده گان را

অচল হয়ে পড়াদের দিকে দয়ার হাত প্রসারিত করুন

যারা আত্মহারা অবোধ তাদের একটু আদরের পরশ দিন।

اگر چه غرق دریای گناهیم
فتاده خشک لب بر خاک راهیم

জানি আমরা গোনাহের সাগরে নিমজ্জমান, তবুও যে

পিপাসার্ত ওষ্ঠাগত পড়ে আছি পথের ধুলিতে।

تو ابر رحمتی آن به که گاهی کلی در حال آب خشکان نگاهی

তাই ভাল হয় যদি তৃষ্ণায় ওষ্ঠাগত প্রাণদের প্রতি

আপনার রহমতের বাদল বর্ধিত হয়, সুনজর দেয়।

خوش آن کز گرد ره سویت رسیدیم بدیده گردی از کویت کشیدیم

বড় সৌভাগ্য হত যদি হামাগুড়ি দিয়ে আসতে পারতাম

আমার নয়নে আপনার গলির ধুলির সুরমা লাগাতাম।

بمسجد سجده شکرانه کردیم چراغت را ز جان پروانه کردیم

মসজিদে নববিতে শোকরানা সিজদায় লুটিয়ে পড়তাম

মসজিদের চেরাগে প্রাণ পতঙ্গের মতো পুড়ে ফেলতাম

بگرد روضه ات گشتیم گستاخ علی چون پنجره سوراخ سوراخ

আপনার রওজার চারিধারে প্রেম উন্মাদনায় চক্কর দিতাম, আমার এ দিল যে বিরহে পিজরার মত ছিদ্র ছিদ্র।

زدیم از اشک ابر چشم بیخواب حریم استان روضه ات آب

বিনিদ্র চোখের অশ্রুর মেঘমালা হতে তারপর

আপনার রওজার আস্তানায় পানি সিঞ্চন করতাম।

گهی رفتیم از آن ساحت غباری گهی چیدیم از و خاشاک خاری

কখনো সাফ করতাম সেই আঙ্গিনার ধুলোবালি

কখনো তার খড়কুটোর কাঁটা বেছে বেছে তুলতাম ।

از آن نور سواد دیده دادیم وزین بر ریش دل مرهم نهادیم

সেই নূর দিয়ে আমার নয়নের জ্যোতি বাড়াতাম

আর এগুলো দিয়ে বিক্ষত হৃদয়ে প্রলেপ দিতাম ।

بسوی منبرت ره بر گرفتیم زچهره پایه اش در زر گرفتیم

আপনার মিম্বর পানে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতাম

হলুদাভ চেহারার রঙে তার পায়াগুলো স্বর্ণালী বানাতাম ।

زمحرابت بسجده کام جستیم قدمگاهت بخون دیده شستیم

আপনার মিহরাবে সিজদায় লুটে মনের সাধ মিটাতাম

আপনার কদমের জায়গা আমার অশ্রুর রক্তে ধুইতাম ।

بیای هر ستون قد راست کردیم مقام راستان درخواست کردیم

প্রতিটি খুঁটির পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম শ্রদ্ধায় আদবের

সত্যনিষ্ঠদের পথে চলবার সামর্থ্যের সেথা আর্জি জানাতাম

زداغ آرزویت با دل خوش زدیم از دل بهر قندیل آتش

আপনাকে চাওয়ার ব্যথায় প্রফুল্ল হৃদয়ে আমার হৃদয়ের আগুনে মসজিদের চেরাগে আগুন জ্বালাতাম

کنون گر تن نه خاک آن حریم ست بحمد الله که جان آنجا مقیم ست

যদিও এই সেহ এখন মদিনার হেরেম শরীফে নেই

আল্লাহর শোকর যে, আমার প্রাণ পড়ে আছে ওখানেই।

بخود در مانده ایم از نفس خود رای ببین درمانده چند و ببخشای

স্বেচ্ছাচারী নফসের কারণে নিজের কাছেই আমি ক্লান্ত

এ ক্লান্ত অক্ষমের প্রতি দয়াদৃষ্টি দিন,ক্ষমা করুন আমাকে।

اگر نبود چو لطفت دستیاری زدست ما نیاید هیچ کاری

আপনার দয়ার হাত যদি প্রশস্ত না হয় হযরত

আমার পক্ষে কোনো কাজ হাসিল হবে না কিছুতেই।

قضا می افکند از راه ما را خدا را از خدا درخواه ما را

ভাগ্যের দুর্বিপাক বারেবারে আমাকে অচল করে ফেলেছে

আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আমাদের তরে।

که بخشد از یقین اول حیاتی دهد آنگه بکار دین ثباتی

তিনি যেন প্রথমত দান করেন একীনের জীবন

এরপর দ্বীনের কাজে দেন অবিচলতা অটুট মন।

چو هول روز رستاخیز خیزد باتش آب روی ما بریزد

উত্থান দিবসের ভয়াবহতা যখন উত্থিত হবে

আগুনের হলকায় আমাদের মান ইজ্জত ভুলণ্ঠিত হবে।

کند با اینهمه گمراهی ما ترا ان شفاعت خواهی ما

আমাদের এত গোমরাহী সত্ত্বেও যেন

শাফায়েতের ঝণ্ডা হাতে আমাদের দরদী হন।

چو چوگان سر گنده آوری روی میدان شفاعت امتی گوی

কোঁকড়ানো লাঠির মতো শির ঝুঁকে আসবেন আপনি

শাফায়াতের ময়দানে মুখে থাকবে উম্মতি উম্মতি!

بحسن اهتمامت کار جامی طفیل دیگران یابد تمامی

আপনার নেক নজরে জামির সকল কাজ যেন

অন্য নেক বান্দাদের তোফাইলে হয়ে যায় সুসম্পন্ন।

মদিনায় যেতে মওলানা জামির বাধাপ্রাপ্ত হওয়া এবং উল্লেখিত না'তটির অতুলনীয় মহিমা সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায় শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া (র.) রচিত দরুদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম-শীর্ষক গ্রন্থে। মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম অনূদিত গ্রন্থটির প্রকাশক ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ। তাতে ঘটনাটির বর্ণনা এরূপ: মাওলানা জামি (র.) এই না'ত রচনা করার পর যখন হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন, তখন তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, রওজা পাকের নিকট দণ্ডায়মান হয়ে এই কবিতা পাঠ করা। হজ্বের পর যখন তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় গমনের ইচ্ছা করেন, ঠিক সেই সময় মক্কার শাসক স্বপ্নে দেখলেন প্রিয় নবিকে (স.)। হযরত (স.) স্বপ্নেই তাঁকে নির্দেশ দিলেন : 'জামিকে মদিনায় আসতে দিওনা। সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হল এবং তাঁকে মদিনায় যেতে বারণ করা হলো। কিন্তু মওলানা জামির আগ্রহ ছিল অসীম। তাই তিনি গোপনে মদিনার পথে পাড়ি জমালেন। তখন মক্কার আমির প্রিয় নবিকে (স.) পুনরায় স্বপ্ন দেখলেন রাসুল (স.) পুনরায় জানালেন: 'সে আসছে। তাকে আসতে দিও না।' মক্কার আমির তখন জামিকে পথ থেকে গ্রেফতার করে জেলখানায় বন্দী করে রাখলেন। তাঁর সাথে কঠোর ব্যবহার করা হলো। তখন পুনরায় মক্কার আমির স্বপ্নে প্রিয়নবি (স.)-এর সাক্ষাত লাভ করলে তিনি ইরশাদ করলেন : জামি কোনো অপরাধী ব্যক্তি নয়। বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, সে কয়েকটি কবিতা রচনা করেছে; যা এখানে এসে পাঠ করতে চায়। সে যদি তা করে, তবে (তাঁর সাথে) করমর্দনের জন্য আমার হাত বের করে দিতে হবে, পরিণাম হবে ফিতনা। শুধু এই জন্যই তাঁকে বারণ করা। এই স্বপ্নের পর মাওলানা জামিকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয় এবং তাঁর প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়। মাওলানা জাকারিয়া (র.) আরো লিখেছেন যে, এই ঘটনা শ্রবণ বা স্মরণে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তা কোন কিতাবে রয়েছে তা খুঁজে দেখার মতো অবস্থা বর্তমানে আমার নেই। তিনি বলেন, আমার দৃষ্টিশক্তির অভাব প্রকট, দুর্বলতা অত্যন্ত বেশি। তাই পাঠকদের খেদমতে নিবেদন, যদি আপনারা আমার জীবদ্দশায় কোনো গ্রন্থে এই ঘটনা দেখতে পান তবে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আর আমার মৃত্যু হয়ে গেলে এই গ্রন্থের টীকায় তা লিপিবদ্ধ করে দিবেন, আমি কৃতজ্ঞ থাকব (জাকারিয়া, ১৯৯৯: ১৫৪-১৫৫)।

চতুর্থ অধ্যায়

জামির (র.) গদ্য সাহিত্যে রাসুল (স.)-এর প্রশংসা

শাওয়াহেদুন নবুওয়াত রচনা

ফারসি ভাষায় মাওলানা আব্দুর রহমান জামি রাসূলে পাক (স.)-এর শানে যেসব না'ত রচনা করেছেন তার আবেদন যেমন কালজয়ী, তেমনি প্রতিটি গানের সুর-ছন্দ ও লালিত্য হৃদয়গ্রাহী। এসব না'তের অর্থ না বুঝলেও এখনো তার সুর লহরি শুনে হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে প্রেমের টানে। জামি (র.) সেই প্রেম ও প্রাণ নিয়ে গদ্যে রচনা করেছেন একটি গ্রন্থ। নাম 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত'- 'নবুয়াতের সাক্ষ্য প্রমাণপঞ্জি' শিরোনাম থেকে যেমনটি প্রতীয়মান হয়, বইটি প্রধানত হযরতের (স.) জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলিনির্ভর। একটি ভূমিকা, সাতটি অধ্যায় ও পরিশিষ্ট দিয়ে সাজানো বইটির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

ভূমিকা : নবি ও রাসূলের অর্থ বর্ণনা

প্রথম অধ্যায় : রাসুলুল্লাহ (স.) এর জন্মের পূর্বে প্রকাশিত নবুওয়াতের প্রমাণাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : জন্মের পর নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্তপ্রকাশিত নিদর্শনাবলি।

তৃতীয় অধ্যায় : নবুওয়াত প্রাপ্তি হতে হিজরত পর্যন্তপ্রকাশিত নিদর্শনাবলি।

চতুর্থ অধ্যায় : হিজরত থেকে ওফাত পর্যন্ত ঘটনাবলি।

পঞ্চম অধ্যায় : সেসব অবস্থা ও ঘটনা প্রসঙ্গে, যেগুলোর বিশেষ সময়কাল জানা যায় নি।

ষষ্ঠ অধ্যায় : সাহাবায়ে কেরাম ও হযরত (স.) এর আহলে বাইত থেকে প্রকাশিত ঘটনাবলি।

সপ্তম অধ্যায় : তাবেয়িন, তাবে তাবেয়িন ও সুফি বুজুর্গগণ হতে প্রকাশিত ঘটনাবলি।

পরিশিষ্ট : ইসলামের শত্রুদের শাস্তি বর্ণনা।

উল্লেখিত অধ্যায়সমূহের শিরোনাম থেকেই জামির (র.) রাসুল (স.)-এর প্রশংসার স্বরূপ ভেসে ওঠে। সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত, তাবেয়িন, তাবে তাবেয়িন ও সুফি-বুজুর্গগণ হতে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাবলিও মূলত হযরত (স.)-এর বদৌলতেই সংঘটিত হয়েছে। নবুয়াতের ফযিলতলব্ধ বিধায় মূলত এগুলোও হযরতের (স.) নিজস্ব গুণ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। কথায় বলে ফলেই গাছের পরিচয়। উপযুক্ত ছাত্রই ওস্তাদের জ্ঞান গরিমার জীবন্ত সাক্ষী। কাজেই উম্মতের পরবর্তী গুণিজনদের গুণগরিমাও হযরতের (স.) জীবনের বৈশিষ্ট্য ও গুণরাজির মধ্যে শামিল। এই দৃষ্টিকোণ হতে শাওয়াহেদুন নবুয়াতকে একটি ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবেও গণ্য করা যায়। যেখানে ইসলামের প্রথম দুই শতকের অলৌকিকতা-নির্ভর ঘটনাবলির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তবে জামি এই গ্রন্থে রাসূলে খোদাকে (স.) ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনাকরেন নি; বরং অলৌকিক ঘটনাগুলোকেই তুলে ধরেছে

এবং হযরত (স.) আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সেতুবন্ধ রচনার অতি-মানবীয় সত্তা, সে দিকটিকে বড় করে দেখিয়েছেন।

জামি তাঁর এই গ্রন্থে সনদ বা বর্ণনা উল্লেখ করেননি। তবে তিনি বর্ণনাগুলোকে নিয়েছেন প্রসিদ্ধ হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থ হতে। যেমন বুখারী ও মুসলিম, মুস্তাগফেরি রচিত 'পালায়েন নবুয়াত', বায়হাকি রচিত 'দালায়েলুন নবুয়াত', যামাখশারী রচিত 'সিলসিলা', ইবনে ও রচিত 'সাফওয়াতুস সাফওয়া, ইবনে শহরাব মাযান্দারানি রচিত 'মানাকেবে আলে আরি তালিব'। যেমন খসরু পারভের এর কাছে লেখা নবিকরিম (স.) এর পত্র এবং নবি করিমকে (স.) হাজির করার নির্দেশ সম্বলিত ইয়েমেনের বাদশাহ বাজান (বা বাজাম)-কে লেখা খসরু পারভেজের নির্দেশনামা ইবনে আসীর এর 'আল-কামিল ফিত তারীখ' ও 'তারীখে তাবারী হতে নিয়েছেন। অন্যান্য যেসব সূত্র হতে জামি তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন, তন্মধ্যে রয়েছে ইবনে সাআদ কাতেব ওয়াকেদির 'আত তাবাকাতুল কুবরা', আবূ নাঈম ইসফাহানির 'হুলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, ইবনে আসির এর 'উসদুল গাবা', ইবনে হিশামের 'আস সিরাতুন নববিয়া', আহমদ ইবনে দাউদ দীনাওয়ারির 'আখবারুত্ তিওয়াল', ইবনে ওয়াদেহ প্রণীত 'তারীখে ইয়াকুবি' প্রভৃতি। ছোট ছোট বাক্যে ফারসিতে সাবলিল ভাষা ও ভাবধারায় রচিত এই গ্রন্থটি ফারসি সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

নবিজি (স.) সর্বশেষ নবি

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইয়্যেদুল মুরসালিন। নবি রাসুলগণের সর্দার মওলানা জামি (র.) একথাও ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি 'খাতামুন্নাবীয়ীন' (সর্বশেষ নবি)। তিনি জ্বিন, ইনসান সকল সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর দ্বীনের আত্মপ্রকাশের কারণে জগতের সকল দ্বীন ও ধর্মমত রহিত হয়ে গেছে। হুজুর (স.) এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হবার সাথে সাথে পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের বিধি-বিধান রহিত হয়ে গেছে। তাঁর নবুয়াত ও রেসালাতের পূর্ণতাই নবুয়াত ও রিসালাতের দরজায় এই সিলসিলা খতম হওয়ার সিল লাগিয়ে দিয়েছে। আর নবুয়াতের দুয়ার চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন হুজুর (স.) এর দাওয়াত ছাড়া সকল দাওয়াত ও আহকাম প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেছে। যে কেউ তাঁর অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং তাঁর শরিয়তের বিধিবিধান মেনে চলা অপরিহার্য ও ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করবে না, সে শয়তান, আল্লাহর দুশমন। সে কাফেরদের মধ্যে গণ্য হবে (জামি, ২০০০: ৮২)।

..و جمله دعدتها مردود الا دعوت وی . هرکه از طریق متابعت او روی بگرداند و احکام

شریعت وی را بر خود واجب و لازم نداند وی شیطان و عدوی رحمان بود و از جمله زنادقه و ملاحده.

নবিজিই (স.) সৃষ্টির মূল

মওলানা আব্দুর রহমান জামি (র.) তাঁর গযল, কাব্য ও অন্যান্য রচনায় অপরাপর সুফি সাধকদের মতো যে সত্যটি ফুটিয়ে তুলেছেন তা হলো নবিজিই (স.) হলেন সৃষ্টির আদি ও মূল। অর্থাৎ, জগৎ সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম মুহাম্মদ মোস্তাফা (স.) এর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। পরে সেই নূরের ঝলক হতে সকল মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত' গ্রন্থে মওলানা জামি (র.) বলেন :

علم و پیغمبر ما - صلی الله علیه و آله وسلم، در عالم شهادت اگر چه آخرین پیامبران بود اما در علم غیب اولین ایشان است کما قال علیه السلام

আমাদের পয়গাম্বর (স.) যদিও দৃশ্যমান জগতে শেষ সময়ের পয়গাম্বর। কিন্তু অদৃশ্য জগতে তিনি সকলের প্রথম ছিলেন। তিনি নিজেই ইরশাদ করেছেন

كنت نبيا و آدم بين الماء والملين"

"আমি তখনও নবি ছিলাম যখন আদম পানি ও মাটির আকারে ছিলেন (অর্থাৎ সৃষ্টি হয়নি)।"

এই হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, প্রবল প্রতাপান্বিত সৃষ্টিকর্তা আদিকালে আপন শানে একটি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। এরপর যে আকৃতি অস্তিত্ব পার করে তাকে বলা হয় 'তাআইয়ুনে আউওয়াল' প্রথম রূপায়ন অথবা হাকিকতে মুহাম্মদি (স.)। অস্তিত্ব জগতের সকল হাকিকত এই এক হাকিকাতেরই অংশ ও বিকশিত রূপ। রূহের স্তরে এই হাকিকতকে বলা হবে অভিন্ন জওহার।

রাসুলে করিম (স.) কখনো এর জন্য আকল (প্রজ্ঞা) শব্দ ব্যবহার করেছেন। কখনো বলেছেন যে, এর অর্থ কলম। কখনো একে রূহ বলে ব্যক্ত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন :

اول ما خلق الله العقل

'আউওয়ালু মা খালাকাল্লাহু আল আকলা'

আল্লাহর সর্বপ্রথম সৃষ্টি হচ্ছে আকল (প্রজ্ঞা)।

اول ما خلق الله القلم'

'আউওয়ালু মা খালাকাল্লাহু আল কালামা

আল্লাহ প্রথমে যা সৃষ্টি করেছেন, তা হচ্ছে কলম।

اول ما خلق الله روحی او نوری

'আউওয়ালু মা খালাকাল্লাহ রূহী আউ নূরী

আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তা হচ্ছে আমার রূহ বা আমার নূর (জামি, ২০০০: ৩)।

রেসালাতের প্রদীপে আলোকিত তাওহিদই গ্রহণযোগ্য

মওলানা আব্দুর রহমান জামি (র.) রাসুল করিম (স.) এর প্রশংসায় যেসব সুক্ষ্ম তত্ত্বকথা উপস্থাপন করেছেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে যে, তাওহিদ বা আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি রেসালাতের প্রদীপে আলোকিত হবে, সেটিই প্রকৃত তাওহিদ। অন্যকথায় দুনিয়ার বাজারে আল্লাহর অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির আদলে একজন সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বনিয়ন্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু তন্মধ্যে কোন পরিচয়টি নির্ভুল তা নিরূপণ করতে হলে একমাত্র পথ হচ্ছে, সেই একত্ববাদ বা তাওহিদ কিংবা আল্লাহর পরিচয়কে মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (স.) এর নবুয়াত ও রেসালাতের আয়নায় পরখ করে দেখতে হবে। অর্থাৎ, নবিজি (স.) আল্লাহর পরিচয় যেভাবে দিয়েছেন সেটিই সঠিক; অন্যসব বাতিল, প্রত্যাখ্যাত। মওলানা জামি (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন,

و امر اول وقتی معتبر است که مقتبس از مشکوۀ نبوت باشد که اگر به مجرد دلایل عقلی اکتفا کنند. چون فلاسفه و از مشکوة نبوت نگیرند، مفید نجات نیست. پس سر همه دولتهاو سرمایه همه سعادتها اقرار و تصدیق نبوت محمد است، صلی الله علیه و آله وسلم.

আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা রেসালাতের প্রদীপ দ্বারা আলোকিত হবে। কেননা, দার্শনিকদের মতো যদি কেবল যুক্তি-তর্ককেই যথেষ্ট মনে করা হয় এবং রেসালাত-প্রদীপের আলো একত্ববাদকে পথ প্রদর্শন না করে, তবে এটা নাজাতের জন্য উপকারী হতে পারে না। সেমতে সকল অর্জন ও ঐশ্বর্যের রহস্য এবং যাবতীয় সৌভাগ্যের পুঁজি হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার একত্ব স্বীকার ও সত্যায়ন করা। এটা ঈমানকে শক্তিশালী করে এবং ঈমানের মূল হচ্ছে রাসুলুল্লাহ (স.) এর সাথে সম্পর্ক ও ভালবাসা স্থাপন করা (জামি, ২০০০:৭৬)।

নবিজির (স.) চেহারা মোবারক ছিল সত্যের উদ্ভাস

নবিজির (স.) চেহারা মোবারক ছিল চতুর্দশী চন্দ্রের মতো সমুজ্জল। সত্যের সন্ধানী যে কেউ তাঁর চেহারা মোবারক দেখলে বুঝতে পারতেন যে, তিনি সত্য, সততা ও ন্যায়ের প্রতীক। তাঁর চরিত্রের সমুদয় সৌন্দর্য যেন তার চেহারায় ঠিকরে পড়ত। মওলানা জামি (র) নবিজির (স.) জীবনের এই অনন্য ও প্রশংসিত বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরেছেন কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে। তিনি বলেন: 'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (র.) পূর্ববর্তী জীবনে একজন ইহুদী আলেম ছিলেন। তিনি বলেন, যখন হযরত (স.) মদিনায় পদার্পণ করলেন তখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি মদিনায় গেলাম। তাঁর ভুবন মোহিনী রূপ ও সৌন্দর্য দেখেই আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, এই পবিত্র মুখমণ্ডল কোনো মিথ্যা দাবিদারের হতে পারে না। আবু বাসিরাহ তায়নি (র.) বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ (স.) এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে দেখার সাথে সাথে আমার মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হল, ইনি আল্লাহ তাআলার রাসুল (স.) (জামি, ২০০০: ৮৭)। মওলানা জামি (র.) আরো বলেন: কুরআন মাজিদের আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, 'এই বিশেষ জায়তুন বৃক্ষের তেল এতো স্বচ্ছ ও উজ্জল যে, অগ্নি স্পর্শ না করলেও যেন জ্বলতে থাকে (আল কুরআন, ২৪:৩৫)।' এই আয়াত সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম লিখেছেন যে, আল্লাহ তাআলা এতে স্বীয় মাহবুর (স.) এর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। জামির ভাষায়-

نزدیک است که منظر وی دلالت کند بر نبوت وی، اگرچه تلاوت قرآن نکند.

অর্থাৎ, হুজুরের (স.) দর্শনই নবুয়তের দলিল- যদিও তিনি কুরআন তেলাওয়াত বা কোনো বাক্যালাপ না করেন এবং চুপচাপ বসে থাকেন (জামি, ২০০০: ১০)।

নবিজি (স.) ইব্রাহীম (আ.) এর দু'আ ও ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদের বহিঃপ্রকাশ

আমাদের প্রিয় নবির (স.) আগমনবার্তা ঘোষণা করেন সকল নবি রাসুল আলাইহিস সালাম।
কারণ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁদের কাছ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন (আল কুরআন, ৩:৮১)।

মওলানা জামি (র) এ মর্মে একটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। হযরত এরবায ইবনে সারিয়াহ (র.) এর রেওয়ায়েত অনুসারে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহর কাছে আমার নাম তখন থেকে 'খাতামুনাবিয়্যিন' (সর্বশেষ নবি) হিসেবে লিখিত ছিল, যখন আদম রূহবিহীন মৃত্তিকা নির্মিত কায়ার অবস্থায় ছিল। আমি তোমাদেরকে আমার সূচনা লগ্নের কথা বলছি। আমি হযরত ইব্রাহীম (আ) এর এই দু'আর বহিঃপ্রকাশ।

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتک.

"পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে একজন মহান রাসুল প্রেরণ করুন, যিনি তাঁদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন (আল কুরআন, ২:১২৯)।"

এরপর হযরত ঈসা (আ) আমার সম্পর্কে এই বলে সুসংবাদ দেন যে,

يا بنى اسر ائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التور اة و مبشرا برسول يأتى منبعدى اسمه احمد

"হে বণি ইসরাইল! আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রসূল! আমি আমার সম্মুখস্থ কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমি একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা। যিনি আমার পরে আগমনকরবেন। তাঁর নাম হবে আহমদ (জামি, ২০০০: ৬১:৬)।

و خوابى كه مادر من آمنه ديد كه نورى از وى ساطع شد كه قصرهاى شام بنمود.

এরপর আমার শ্রদ্ধেয়া জননীর স্বপ্নও আমার আগমনের সংবাদ দেয়। যাতে তিনি দেখেন যে, তার মধ্যে থেকে একটি নূর চমকে উঠল, যার কারণে তার দৃষ্টির সামনে সিরিয়া অঞ্চলের সকল রাজপ্রাসাদ আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

তাওরাতে প্রতিশ্রুতি নবির সাক্ষ্য প্রসঙ্গ

মহানবি (স.) যে সত্য নবি তা দুনিয়ার সকল ধর্ম ও বিজ্ঞজন স্বীকার করেছেন, করতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যতম আসমানী গ্রন্থ তাওরাতও এর ব্যতিক্রম নয়। এ প্রসঙ্গে মওলানা জামি (র) এর বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য,

তাওরাতের পঞ্চম সফর দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত আছে সত্তরজন ইহুদী আলেম, কয়েকটি বাক্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঐকমত্য ব্যক্ত করেছেন। বাক্যগুলোর অনুবাদ নিম্নরূপ-

আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.) কে সম্বোধন করে বলেন- নিশ্চয়ই আমি বণি ইসরাইলের জন্য তাদের ভাইদের মধ্য থেকেই একজন নবি প্রতিষ্ঠিত করব, সে তোমার অনুরূপ হবে। অতঃপর আমার কালাম তার মুখে জারি করব। সে তাদেরকে তাই বলবে, যা আমি আদেশ করব। সে আমার নামে যে সকল কথা বলবে, সেগুলো যে অমান্য করবে, আমি তাকে অবশ্যই শাস্তি দেব।

এ সকল বাক্য থেকে তাওরাতের সাক্ষ্য এভাবে বুঝা যায় যে, এই উক্তি থেকে প্রতিশ্রুত পয়গাম্বরের দু'টি বিশেষ গুণ বুঝা যায়। এগুলো কেবল আমাদের পয়গাম্বর মুহাম্মদ (স.) এর মধ্যেই পাওয়া যায়; অন্য কারো মধ্যে নয়। প্রথম গুণ এই যে, প্রতিশ্রুত পয়গাম্বর ইয়াকুব (আ.) এর সন্তান বণি ইসরাঈলের মধ্যে থেকে হবেন না। কেননা, তাদের ভাইদের মধ্য থেকে বলা হয়েছে এবং 'তাদের'- অর্থ হচ্ছে বণি ইসরাঈল। সুতরাং তাদের ভাই এর অর্থ হবে তাদের চাচাত ভাই অর্থাৎ হযরত ইসমাইল (আ.) এর সন্তান। বলা বাহুল্য ইসমাইল (আ.) এর সন্তানদের মধ্যে আমাদের পয়গাম্বর মুহাম্মদ মোস্তফা (স.) ছাড়া কারো মধ্যে নবুয়াতের চিহ্ন ও আলামত প্রকাশ পায় নি (জামি, ২০০০: ৮৭)।

দ্বিতীয় গুণ এই যে, প্রতিশ্রুত পয়গাম্বর হযরত মুসা (আ.) এর অনুরূপ দৃঢ়চেতা শৌর্য-বীর্যশালী ও শরিয়তধারী হবেন। এ থেকেও একথা পরিষ্কার যে, মুসা (আ.) এর পরে হযরত মুহাম্মদ (স.) ছাড়া কোনো শৌর্য-বীর্যশালী ও নবুয়তধারী পয়গাম্বর প্রেরিত হন নি (জামি, ২০০০: ৮৭-৮৮)।

মওলানা জামি (র) এ প্রসঙ্গে প্রতিশ্রুত পয়গাম্বর ঈসা (আ.) হওয়ার ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের সম্ভাব্য দাবি খণ্ডন করে বলেছেন যে, ঈসা (আ.) বণি ইসরাইল বংশের লোক ছিলেন। কাজেই তাদের ভাইদের মধ্য হতে কথাটি তার বেলায় প্রযোজ্য হবে না। দ্বিতীয়ত: তিনি স্বতন্ত্র শরিয়তধারী ছিলেন না। বরং তিনি মুসা (আ.) এর শরিয়তের পূর্ণতাদানের জন্য আগমন করেছিলেন (জামি, ২০০০: ৮৮)।

ইঞ্জিলে প্রতিশ্রুত পয়গাম্বর সম্পর্কে সাক্ষ্য

অন্যান্য পয়গাম্বরদের মত হযরত ঈসার (আ.) প্রিয় নবিজির (স.) আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। মওলানা জামি (র) এ মর্মে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন,

ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আ.) ইরশাদ করেন, আমি অচিরেই তোমাদের পরওয়ারদেগার এর দিকে চলে যাব এবং আমার পরে আরো একজন আল্লাহর প্রতিনিধি আগমন করবেন। তিনি আমার সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য দিবেন। যেমন আমি তার সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য দিয়েছি। ফার্কেলিতে প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিত

বর্ণনা করবেন এখানে উদ্দেশ্য আমাদের পয়গাম্বর (স.)। ফার্কেলিত শব্দটি আহমদ শব্দের প্রায় সমার্থক ইঞ্জিল অনুযায়ী এর অর্থ মানুষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হযরত ঈসা (আ.) এর মাধ্যমে অত্যন্ত বিশুদ্ধরূপে জানা গেছে যে, তিনি মুহাম্মদ-এ আরবির (স.) দ্বীন সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন এবং মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তারপরে আসবেন। হাওয়ারীরা যখন এই সুসংবাদ অবগত হয় তখন তারা বিশ্বাস করে নেয় (খান (অনু.), ২০০৭: ১৯)।'

নবিজির (স.) প্রতিকৃতি সম্পর্কে জামির বক্তব্য

সৃষ্টির সূচনা হতে নবি করিম (স.) এর ছবি সংরক্ষিত ছিল মর্মে জামি (র.) দু'টি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন শাওয়াহেদুন নবুয়াত গ্রন্থে। নিঃসন্দেহে এ তথ্যটিও নবিজির (স.) অনন্য প্রশংসিত বৈশিষ্ট্য। প্রথম বর্ণনাটি হযরত জুবাইর (র.) সূত্রে। নবুয়তের প্রথমদিকে তিনি মক্কা ছেড়ে সিরিয়া যাবার পথে এক ইহুদী উপাসনালয়ে যাত্রা বিরতি করেন। সেখানকার ইহুদী আলেম তাঁকে মক্কার হেরেম এর অধিবাসী বলে জানতে পেরে উপাসনালয়ে রক্ষিত কতক পুরনো ছবি দেখান। একে একে অনেক ছবির মাঝ থেকে হযরত আবুবকর (র.) এর ছবিসহ একটি ছবি দেখিয়ে চিনেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে ইহুদী আলেম বলেন যে, এটি নবির প্রতিকৃতি, ইনি তোমাদের নবি। অপরজন তাঁর খলিফা। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাকে বিজয়ী করবেন।

দ্বিতীয় বর্ণনা হিশাম ইবনুল আস (র.) সূত্রে। তিনি বলেন যে, আমীরুল মু'মেনিন আবুবকর সিদ্দিক (র.) তাঁকে এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য, তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া। ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে হিরাক্লিয়াসের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। রোম সম্রাট তাঁকে একে একে অনেকগুলো ছবি একটি সংরক্ষিত সিন্দুক হতে বের করে দেখান। সবশেষে সাদা রঙের রেশমি কাপড়েসংরক্ষিত একটি ছবি দেখালে তিনি কান্নায় আপ্লুত হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন যে, এটি নবি করিম (স.) এর প্রতিকৃতি। মওলানা (র.) এসব ছবি যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত হয়ে রোম সম্রাট পর্যন্ত কিভাবে আসল তারও বর্ণনা দিয়েছেন।

পূর্ববর্তী উম্মতগণের মাঝে রাসুল করিমের (স.) প্রশংসা

মওলানা জামি (র.) শাওয়াহেদুন নবুয়াত এ পূর্ববর্তী উম্মতগণের মাঝে রাসুলে করিম (স.) এর গুণ বৈশিষ্ট্য, চরিত্র ও আদর্শচর্চার বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। এসব বৈশিষ্ট্য ও বর্ণনা সামনে রাখলে হযরত

(স.) আল্লাহ তাআলার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কত মহান চরিত্র আদর্শে ভূষিত ছিলেন, তার কিঞ্চিত আভাস পাওয়া যায়। মওলানা জামি (র) হযরত ইয়াহুয়া (আ.) এর যবানিতে নানা প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা করে বলেন-

'আমি তাদের মধ্যে থেকে এমন একজন পয়গাম্বর উত্থিত করব যিনি বধিরকে কর্ণ দান করবেন, এতকে চক্ষু দান করবেন এবং অন্তরের উপর থেকে যবনিকা সরিয়ে দিবেন। মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে দিবেন না বরং ক্ষমা ও মার্জনা করবেন। মু'মিনদের প্রতি দয়াবান হবেন। জন্তু জানোয়ারের পিঠে অতিরিক্ত বোঝা দেখে দুঃখ ও বেদনা অনুভব করবেন। বিধবা নারীও অনাথ শিশুদেরকে স্নেহের কোলে আশ্রয় দিবেন। তাঁর পরিবারের মধ্যে ইসলামে অগ্রবর্তী, সিদ্দিক, শহিদ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি হবেন। এরপর তাঁর উম্মত ন্যায় ও সত্যের দিকে মানুষকে পথ প্রদর্শন করবে। সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করবে। নামাজ ও রোজা পালন করবে। অঙ্গীকারপূর্ণ করবে। আমি যে নবুয়াতের সূচনা করেছি তাঁর মাধ্যমেই এর পরিসমাপ্তি করব। এসব কিছু তাদের জন্য আমার অনুগ্রহ ও কৃপা। আমি যাকে ইচ্ছা, যা ইচ্ছা, দান করি। আমি মহা অনুগ্রহকারী (খান (অনু.), ২০০৭: ২৪-২৫)।

নূরনবি হযরত (স.)

আমাদের প্রিয় নবি (স.) মানুষ ছিলেন; তবে সাধারণ মানুষ নন। ইনসানে কামিল, পূর্ণ মানব ছিলেন তিনি। দেহগতভাবে মানুষ হলেও জওহার বা সত্তাগতভাবে তিনি ছিলেন নূর। এই জগত সৃষ্টির আগে থেকেই এই নূরের বিদ্যমান থাকা প্রমাণিত। এ সম্পর্কে মওলানা জামির (র.) উক্তি হাদীস শরীফের ভাষ্য আকারে ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। মওলানা জামি (র) বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করেছেন যে, হযরতের (স.) নূর বা দেহ সত্তার যে অনুক্ত অংশ আদি পিতা হযরত আদম (আ.) এর দেহের মধ্যে ছিল, তা একটি নির্মল জ্যোতির আকারে আদম (আ.) এর কপালে চকচক করত। সেখান থেকে তা হযরত হাওয়া (আ) এর গর্ভে, অতপর শিস (আ) এর ঔরসে ও বংশানুক্রমে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পুত্র ইসমাঈল (আ.) এর সূত্রে অবশেষে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের ঔরস পর্যন্ত পৌঁছে।

মওলানা জামি এ মর্মেও একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, কোনো কোনো অতিন্দ্রীয়বাদী মহিলা এই নূর গর্ভে ধারণ করবার জন্য হযরত আব্দুল্লাহর সান্নিধ্যের আকাঙ্খী ছিল। এমন কি ইহুদীরা এ কারণে একবার হযরত আব্দুল্লাহর ওপর পরিকল্পিত হামলা চালায়। কিন্তু অলৌকিকভাবে তিনি তাদের হাত থেকে প্রাণে রক্ষা পান। শেষ পর্যন্ত মা আমেনার সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হলে হযরতের (স.)

নূর স্থানান্তরিত হয়ে মা আমেনার কোল আলোকিত করেন। যার দীপ্তিতে অনন্তকালের জন্য গোটা বিশ্ব জগৎ উদ্ভাসিত হয় (জামি, ২০০০: ৩২-৩৫)।

আদম (আ.), নূহ (আ.), ইব্রাহীম (আ.) ও ঈসা (আ.) প্রমুখনবিগণের গুণ বৈশিষ্ট্যের ধারক ছিলেন মহানবি (স.)। মওলানা জামি (র) মা আমেনার গৃহে নবিজির (স.) জন্মের রাতের এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট রচনা করেছেন। বেহেশতি রমনীরা কিভাবে আগমন করলেন, পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত কিভাবে উদ্ভাসিত হল, শিশু মুহাম্মদকে (স.) কিভাবে পৃথিবী পরিভ্রমণ করানো হলো তার বিবরণ দিয়েছেন নানা উপমা উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে। তারপর মা আমেনার জবানিতে তিনি বলেন, এরপর পূর্বের চেয়ে বড় একটি মেঘখণ্ড আগমন করল। এতে আমি মানুষ ও অশ্বের পদধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি কাউকে বলতে শুনছিলাম সকল জ্বিন, মানব ও পশুপক্ষিকে মুহাম্মদ (স.) এর সাক্ষাত দান করানো হয়েছে। অতপর তাঁকে আদমের (আ.) মহত্ত্ব, নূহ (আ.) এর নম্রতা, ইব্রাহীম (আ.) এর রূপ মাধুরী, ইয়াকুব (আ.) এর ত্বক, দাউদ (আ.) এর আকৃতি, আইয়ুব (আ.) এর সবর, ইয়াহইয়া (আ.) এর সংসার বৈরিতা ও ঈসা (আ.) এর দানশীলতা প্রদান করা হয়েছে (খান (অনু.), ২০০৭: ৩৭) ।

মহানবি (স.) এর জন্মের রাতে প্রকাশিত দশটি নিদর্শন সম্পর্কে জামির ভাষ্য

মওলানা আব্দুর রহমান জামি (র.) নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্মের রাতে বহুবিধ অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হবার বর্ণনা দিয়েছেন বিভিন্ন বর্ণনাসূত্র অবলম্বনে। তিনি উল্লেখ করেন যে, হজরতের (স.) জন্মের রাতে দশটি অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল। এগুলো ছিল:

১। ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে তিনি সেজদাবনত হন।

২। সেজদা থেকে মাথা তুলে স্পষ্ট ভাষায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইন্নি রাসুলুল্লাহ বলেন।

৩। তাঁর মুখমণ্ডলের নূরে সারা ঘর উজ্জ্বল ছিল।

৪। জন্মের পর গোসল দিতে চাইলে গায়েবি আওয়াজ হয় আমি আমার মাহবুবকে পাক-সাফ সৃষ্টি করেছি, গোসলের প্রয়োজন নাই।

৫। তিনি খতনা করা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন।

৬। তাঁর পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবুয়ত অঙ্কিত ছিল।

৭। তাঁর ভদ্ধের মধ্যস্থলে অঙ্কিত ছিল লা-ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

৮। প্রতিমাসহ কাবাগৃহ মকামে ইব্রাহীমের দিকে। সিজদায় লুটিয়ে পড়ে

৯। সাফা ও মারওয়ায় ফেরেশতাদের কোলাহল জাগে এবং

১০। আব্দুল মুত্তালিব শিশু মুহাম্মদের (স.) জন্মের সংবাদ বাইরে প্রকাশ করতে চাইলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত তার জিহবা বন্ধ হয়ে যায় (জামি, ২০০০: ১১৩)।

নবিজির (স.) জন্মে পারস্য রাজ প্রাসাদের দ্বারমণ্ডপে ফাটল সৃষ্টি প্রসঙ্গে

মওলানা জামি (র) নবিকরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় বহু অলৌকিক ঘটনাকে সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করেছেন। তন্মধ্যে বিশ্বলোকে সংঘটিত নানা বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে: হযরতের (স.) জন্মগ্রহণের সমকালে পারস্য সম্রাটের রাজপ্রাসাদের দ্বারমণ্ডপে চৌদ্দটি ফাটল সৃষ্টি, হাজার হাজার বছর ধরে প্রজ্জ্বলিত পারস্যের অগ্নি উপাসকদের পূজা অগ্নিকুণ্ড হঠাৎ নির্বাপিত হওয়া, পারস্যের সাওয়া নদী শুকিয়ে যাওয়া আর অগ্নি উপাসক পুরোহিত মুআবেবদ এর বিস্ময়কর স্বপ্ন, যাতে তিনি দেখতে পান যে, কিছু সংখ্যক বল্গাহীন অবাধ্য উট আরবি ঘোড়াসমূহকে মেরে মেরে তাড়িয়ে নিয়ে দজলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

এছাড়া রাজ প্রাসাদ প্রকম্পিত হয়ে চৌদ্দটি দারমণ্ডপে ফাটল সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনে পারস্য সম্রাটের বিচলিত অবস্থা ও গণকদের কাছে এর ব্যাখ্যা চাওয়া। এর ব্যাখ্যায় জ্যোতিষীদের অবিমৃষ্যকারিতা এবং সবশেষে একজন পয়গাম্বরের আগমনের ভবিষ্যৎবাণী প্রভৃতি ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ ও সরস বর্ণনা দিয়েছেন মওলানা জামি (র) (জামি, ২০০০: ১১৪)।

শিশু নবির (স.) দুগ্ধ পান, বরকতের জোয়ার ও ইনসাফের পরাকাষ্ঠা

নবিকরিম (স.) সমগ্র জাহানের জন্য অফুরান রহমত। এই রহমতের বর্ষণ শুরু হয়েছে তাঁর জন্মের শুরু থেকে। মওলানা জামি (র.) হযরত মুজাহিদ ও ইবনে আব্বাস (র.) এর মধ্যকার সংলাপসূত্রে হযরতকে (স.) স্তন্যদানের জন্য সমগ্র সৃষ্টির প্রতিযোগিতার চমৎকার বিবরণ পেশ করে বলেছেন যে, নবিজিকে (স.) স্তন্যদানের সৌভাগ্য কেবল মানুষের ভাগ্যেই নির্ধারিত। সেই সুবাদে জন্মের পর মা হালিমার (র.) আগমনের পূর্বে আবু লাহাবের বাদী সুওয়াইবা নবিজিকে (স.) দুধ পান করান।

তৎকালীন আরবের নিয়ম অনুযায়ী লালন-পালনের উদ্দেশ্যে শিশু আনার জন্য দুধমাতা হালিমার (র.) মক্কায় আগমন, তার জীর্ণশীর্ণ বাহন উঠা ও গাধার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হতশ্রী অবস্থা, গর্ভজাত পুত্র হামজার জন্যও হালিমার দুগ্ধ পর্যাপ্ত না হওয়া প্রভৃতি করুণ অবস্থার মধ্যে শিশু মুহাম্মদ (স.) কোলে আসার

সাথে সাথে বরকতের জোয়ার বয়ে যাওয়া, গাধা ও উষ্ট্রীর চলার গতিতে উচ্ছলতা, হালিমার (স.) স্তনে দুধের প্রাচুর্য আর দুঃখের দিনের অবসান প্রভৃতি ঘটনার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়ে মওলানা জামি (র.) বলেছেন যে, আশ্চর্য হল দুধমাতা হালিমা (র.) কেবল ডান স্তনটিতে শিশু মুহাম্মদকে (স.) দুধ পান করাতে পারতেন। তিনি বাম স্তন কখনো পান করতেন না। কারণ মা হালিমার (র.) গর্ভজাত সন্তান হামজাও ছিলেন একই সাথে দুধপানে অংশীদার আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহাম যোগে আদিষ্ট হওয়াতে শিশুনবি মুহাম্মদ (স.) দুগ্ধপান অবস্থাতেই দুধ ভাইয়ের সাথেও সাম্য ও ইনসাফের পরাকাষ্ঠা দেখান। জামি (র.) হযরত ইবনে আব্বাসের (র.) রেওয়ায়েত সূত্রে এ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন (জামি, ২০০০: ১১৮)।

দুগ্ধ পানের দিনগুলোতে

নবি করিম (স.) যখন শিশু ছিলেন, যখন মা হালিমার দুধ পান করতেন, তখনকার ছোট ছোট অনেক ঘটনা নিয়ে মওলানা জামি (র.) রাসূলে পাক (স.) এর প্রশংসা করেছেন। আগেই উল্লেখ করেছি যে, শিশু নবি (র.) কখনো দুধমাতার দু'টি স্তন চুষতেন না; বরং ডান স্তনটি পান করতেন আর বাম স্তনটি রেখে দিতেন তাঁর দুধভাই হামজার জন্য।

মওলানা জামি (র.) মা হালিমার (র.) জবানিতে বলেন যে, কেউ যখন মুহাম্মদ (স.)- এর নিকটবর্তী হয়ে কথা বলত তখন আশ্চর্যজনকভাবে একটি আওয়াজ উঠত এবং তিনি তখন 'আল্লাহু আকবর' 'আল্লাহু আকবর' 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলতেন (খান, ২০০৭: ৪৩)।

হালিমার (র.) বর্ণনা মতে শিশু মুহাম্মদ (স.) দুই মাস বয়সে শিশুদের মত নিতম্বের উপর ভর দিয়ে চলতেন, পাঁচ মাসে ওঠে পা পা করে চলতেন। ছয় মাস হলে দ্রুত চলতে শুরু করেন। সাত মাস বয়সে স্বাধীনভাবে এদিক সেদিক চলে যেতেন আর বয়স দশ মাস হলে শিশুদের সঙ্গে তীরন্দাজী করতেন ।

মা হালিমা (র.) আরো বলেন, শিশু মুহাম্মদকে (স.) নিয়ে আসার পর আমাদের ছাগলগুলো মোটাতাজা হয়ে স্তনগুলো দুধে ভরে যায় আর বনু সা'দ গোত্রের মাঠ-ঘাট, চারণভূমি সুজলা সুফলা ও শস্য-শ্যামলা হয়ে ওঠে।

মেঘমালার ছায়াদান

নবিকরিম (স.) প্রখর রৌদ্রে চলার সময় সূর্যকে আড়াল করে মেঘখণ্ড এসে মাথার উপর ছায়া দিত। এই ঘটনা বহুবার ঘটেছে। মওলানা জামি (র.) দুধ মা হালিমার (র.) কাছে থাকা অবস্থায় তিন বছর বয়সে এমন অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বলে বর্ণনা দিয়েছেন। দুধ-বোন সায়মা এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছিল মায়ের কাছে (জামি, ২০০০: ১১৯)। মওলানা জামি (র.) আরেক ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, বারো বছর বয়সে চাচা আবু তালেবের সঙ্গে সিরিয়া যাবার পথে খ্রিষ্টান পুরোহিত বুহাইরার সাথে সাক্ষাতের সময়ও সাদা মেঘখণ্ডের ছায়াদানের অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়।

শৈশবে বক্ষ বিদারণের ঘটনা

মওলানা জামি (র.) শৈশবে নবিজির (স.) বক্ষ বিদারণের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন মা হালিমার (র.) যবানিতে। সে বর্ণনা অনুযায়ী দুধভাই হামজা ও অন্য বালকদের সঙ্গে মেষ নিয়ে চারণভূমিতে খেলারত অবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁকে ছোঁ মেরে পাহাড়েনিয়ে যায়। সেখানে তিন ব্যক্তি তাকে শায়িত করে নাভি পর্যন্ত বক্ষদেশ বিদীর্ণ করে। তারপর হৃদপিণ্ডটি বের করে রূপার তশতরিতে রেখে কালচে পদার্থ ধুয়ে সাফ করে পুনরায় তা যথাস্থানে রেখে দেয় এবং বক্ষদেশ সেলাই করে দেয়। এ ঘটনার পরই মা হালিমা ছেলের নিরপত্তার ব্যাপারে শংকিত হয়ে তাঁকে মা আমেনার কাছে ফিরিয়ে দেন।

মুহাম্মদের (স.) নাম শুনে প্রতিমা হুবল নতশির হয়

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শৈশব জীবন অসংখ্য অলৌকিক ঘটনায় ভরা। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, মা হালিমা (র.) শিশু মুহাম্মদকে (স.) মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে আসবার সময় পথিমধ্যে হঠাৎ শিশু নিরুদ্দেশ হয়ে যান। দুধ-মা হালিমা (র.) শিশুকে হারিয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন। নিরুপায় হয়ে ছুটাছুটি করতে দেখে এক বুড়ো শিশুর সন্ধান দিতে প্রতিমা হুবলের কাছে সাহায্য চাইতে বলে। কিন্তু সাদিয়া (র.) রাজি হন নি। অগত্যা বুড়ো হুবলকে যথানিয়মে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে যখন হারানো শিশু মুহাম্মদের (স.) সন্ধান দেয়ার জন্য আর্তি জানায়। তখন মুহাম্মদ (স.)-এর নাম শুনতেই হুবল ও অন্যসব প্রতিমা আভূমি নত হয়ে যায়। এ দৃশ্য দেখে বুড়ো ভীত হয়ে ফিরে এসে বলে হে সাদিয়া! তোমার গোত্রের পরওয়াদেগার তাঁকে বিনষ্ট হতে দেবেন না। অস্থির হয়োনা। চুপচাপ তাঁকে তালাশ করতে থাক।

چون نام محمد صل الله علیه وسلم بر زبان راند ، هبل و سایر اصنام سرنگونبر زمین افتادند .و گفتند :ای شیخ ! هلاک ما نخواهد بود مگر بر دست محمد . شیخ گریان و لرزان بازگشت و گفت :این سعدیه فرزند ترا پرواز دگاری است که وی را ضایع نگذارد .دل تنگ مباش و به آهستگی طلب کن .

দুধ-মা হালিমা (র.) আরো ভীত হয়ে আব্দুল মুত্তালিবকে ঘটনা অবহিত করলে তার আহ্বানে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। অবশেষে তিনি ৭ বার কাবাঘরের তওয়াফ করলে গায়েবি আওয়াজ আসে যে, মুহাম্মদ (স.) তেহামা উপত্যকায় অমুক বৃক্ষের নিকটে আছে। আব্দুল মুত্তালিব ওয়ারাকা ইবনে নওফলসহ শিশু মুহাম্মদ (স.) কে সেখানে খেলায়রত পেয়ে বুকে জড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে আসেন। মওলানা জামির (র.) ভাষায় হযরত ইবনে আব্বাস (র.) রাসুলে কারিমের (স.) কতক প্রশংসা গাঁথায় এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন (জামি, ২০০০: ১২১-১২২)।

দোলনায় তাঁর খেলনা ছিল আকাশের চাঁদ

শৈশবে নবি করিম (স.)-এর জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, দোলনায় থাকতে তাঁর খেলনা ছিল আকাশের চাঁদ। মওলানা জামি (র.) হযরত আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (হযরত আব্বাস র.) একদিন নবিকরিম (স.)-কে বললেন, আপনার দ্বীনের দাওয়াত আমি তখন থেকে পেয়ে গিয়েছিলাম যখন আপনি দোলনায় ছিলেন। আপনি চাঁদের সাথে কথা বলতেন। দোলনায় থেকে আপনি চাঁদকে যেদিকে ইশারা করতেন চাঁদ সেদিকে ঝুঁকে পড়ত। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি তার সাথে কথা বলতাম এবং সে আমাকে কাঁদতে মানা করত। চাঁদ যখন আরশের নিচে সেজদা করত তখন তার আওয়াজ আমার শ্রুতিগোচর হত।

শিশু নবির (স.) প্রশংসায় মদিনার ইহুদীরা

দুধ-মা হালিমার কাছ থেকে শিশুনবি মা আমেনার কোলে ফেরার পর তিনি শিশুপুত্রকে নিয়ে মদিনায় বাপের বাড়ি বেড়াতে যান। স্বামী আব্দুল্লাহর কবর জিয়ারত ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। শিশুর দেখভালের জন্য সঙ্গে নেন উম্মে আয়মন নাম্নী জনৈকা দাসীকে। মওলানা জামি (র.) সে সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখ করেন নবিকরিম (সা.) এর স্মৃতিচারণ থেকে। হযরতের স্মৃতিকথা অনুযায়ী

মদিনার এক ইহুদী একদিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হযরতের নাম জিজ্ঞাসা করে। হযরত নিজের নাম আহমদ বলে জানালে সে হযরতের পৃষ্ঠদেশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সে বলল যে, এ এই উম্মতের পয়গাম্বর হবে। সে হযরতের আরো খোঁজ খবর নিতে থাকলে মা আমেনা ভয় পেয়ে মদিনা ত্যাগ করেন।

উম্মে আয়মনের সূত্রে অপর এক ঘটনায় দু'জন ইহুদী এসে মক্কার সুন্দর শিশুটিকে দেখবার আবদার করে। তারা শিশুকে; বিশেষ করে তাঁর পৃষ্ঠদেশ গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে একে অপরকে বলল: ইনি এই উম্মতের পয়গাম্বর। এ শহর হবে তার দারুল হিজরত। এ শহরেও অনেক ওলট পালট হবে।

আবিসিনিয়ার সম্রাটের মুখে রাসূলে খোদার প্রশংসা

আফ্রিকান দেশ আবিসিনিয়ার বর্তমান নাম ইথিওপিয়া। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর মহানবি (স.)-এর হিজরতকারী সঙ্গীদের আশ্রয়দান ও ঈমান আনয়নের ঘটনা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। আমরা এখানে আবিসিনিয়ার আরেকজন বাদশাহর কথা বলব, যিনি হযরতের শৈশবকালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। মওলানা জামি (র.)-এর বর্ণনা মোতাবেক সে বাদশাহর নাম ছিল সায়ফ ইবনে জিবসন। এ সময় আব্দুল মুত্তালিব এবং কুরাইশ বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাকে মোবারকবাদ জানানোর জন্য সানায় গমন করেন। এরপর বাদশাহর সাথে আলাপচারিতায় আব্দুল মুত্তালিবের বংশগত পরিচয় লাভের পর বাদশাহ তাদের ধর্মগ্রন্থের বরাতে বললেন, আমি আমাদের ঐশীগ্রন্থে এক মহাসংবাদ পাঠ করেছি, যার মধ্যে আপনাদের এবং সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিহিত। সংবাদ এই যে, এক পবিত্র শিশু মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছে বা করবে। তার নাম মুহাম্মদ। তার পিতামাতা মারা যাবে এবং চাচা ও দাদা তার লালন পালন করবে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে রাসুল করে প্রেরণ করবেন এবং আমাদের করবেন তার মদদগার ও সাহায্যকারী। তিনি স্বীয় বন্ধুদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখবেন এবং শত্রুদেরকে কাছে আসতে দিবেন না। এরপর তিনি তার বন্ধুদেরকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন এবং যাকে ইচ্ছা উত্তম বস্তুর মালিক করে দিবেন। তার কারণে কুফরের অগ্নি নির্বাপিত হয়ে যাবে। অধিকাংশ লোক আল্লাহর ইবাদতের তরিকা অবলম্বন করবে। শয়তানরা বিতাড়িত হয়ে যাবে। তাঁর উক্তি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হবে। তার নির্দেশ আদ্যোপান্ত সুবিচার ভিত্তিক হবে।

তিনি নিজে তা পালন করবেন। তিনি অসৎকাজ করতে নিষেধ করবেন এবং নিজে তা থেকে বিরত থাকবেন।এই আলাপচারিতায় বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায় এবং আব্দুল মুত্তালিব শিশু মুহাম্মদের

(স.) পরিচয় দান করেন। সম্রাট বিষয়টি ইহুদীদের কাছ থেকে গোপন রাখার সুপারিশ করেন। তিনি সেই নবির সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং মদিনা তার রাজধানী হবে মর্মেও তথ্য জানান। পরে অগাধ উপহার দিয়ে প্রতিনিধি দলকে বিদায় করেন (খান অনু. ২০০৭: ৫০)।

খাজা আবু তালেবের পরিবারে বরকতের সওগাত

দাদা আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকালের পর শিশু মুহাম্মদের (স.) লালন-পালনের ভার ন্যস্ত হয় চাচা আবু তালেবের ওপর। তখন হযরতের বয়স ছিল আট বছর। আবু তালেব তাকে অত্যধিক মহব্বত করতেন। মওলানা জামি বর্ণনা করেন যে, আবু তালেবের পরিবার যখন শিশু মুহাম্মদকে সাথে নিয়ে খেতে বসত তখন সবাই তৃপ্তি সহকারে খেতে পারত। শিশু মুহাম্মদ (স.) এক সাথে না বসলে খাবারে তৃপ্তি ও বরকত হত না। এসব কারণে দুধ পান করার সময় সবার আগে মুহম্মদ (স.) পান করতেন। দুধ বেঁচে গেলে আবু তালেব বলতেন,এসব তোমারই বরকত।

কাজল নয়ন সোনালী কেশর

মওলানা জামি (র.) বর্ণনা করেন যে, শৈশব হতে শিশু নবির (স.) দুই চোখ ছিল কাজল বরণ । সুরমা ব্যবহার ছাড়াই মায়াবী কাজল যুক্ত দেখাতো তার দুই নয়ন। তিনি বলেন যে, মুহাম্মদ (স.) শৈশবে সকালে নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে আবু তালেবের শিশুদের মজলিসে উপস্থিত হতেন, তখন তাদের সবার চুল আলুথালু থাকতো। অথচ মুহম্মদের (স.) সোনালী কেশ চিরুনি করা ছাড়াই পরিপাটি থাকত।

چون رسول بامداد از خواب برخواستي و مجمع فرزندان ابو طالب را به جمال خود بياراستی، همه را مويها در هم شكسته بودی و مژگان بر هم بسته و وی را موی عنبرين رمه ناک بودی.سرمبی شانه شانه كرده و چشم جهان بين بی سرمه ناک بودی

কিশোর নবির (স.) প্রশংসায় বুহাইরা রাহেব

চাচা আবু তালেব বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাবার মনস্থ করলে শিশু নবি চাচার সাথে যাবার জন্য বায়না ধরেন। তখন বয়স তাঁর বারো বছর। চাচা অগত্যা ভাতিজাকে সাথে নিয়ে রওনা হন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে। মওলানা জামি (র.) এই ঐতিহাসিক ঘটনার সুবিস্তারে বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে, সিরিয়ার

উপশহর বুসরায় পৌঁছলে সেখানকার খ্রিষ্টান তাপস সন্ন্যাসী বুহাইরার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় কাফেলার প্রতি। তিনি কাফেলার গতিবিধি ও কোনো এক ব্যক্তির ওপর আকাশের মেঘখণ্ড ছায়াপাত করা আর গাছের পত্রপল্লব কারো জন্য ঝুঁকে পড়ার দৃশ্য নিরীক্ষণ করে। কাফেলার লোকদের ভোজের আমন্ত্রণ জানান। ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে কিশোর মুহাম্মদ (স.) ভোজ সভায় উপস্থিত হলে বুহাইরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যান এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তিনি শেষ নবির যেসব চিহ্ন ও আলামত পাঠ করেছিলেন সবই তার মধ্যে দেখতে পান। বুহাইরা ঘনিষ্ঠ হয়ে আরবদের নিয়মে লাত ও ওজ্জার কসম দিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইলে হযরত (স.) লাত ও ওজ্জার প্রতি চরম ঘৃণা প্রকাশ করেন। বুহাইরা অনেক অনুরোধ করে পৃষ্ঠদেশের মোহরে নবুওয়াত দেখতে সক্ষম হন। পরিশেষে তিনি চাচা আবু তালেবকে সুপারিশ করেন যে, এই বালককে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান। ঈহুদীদের কাছ থেকে তাকে সতর্ক পাহারায় রাখবেন। কারণ, তার সম্পর্কে আমি যা জেনেছি, তা তারা জানতে পারলে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে পারে। এভাবেই খ্রিষ্টান পাদ্রী বুহাইরা নবুয়াতের সাক্ষ্য ও হযরতের ভূয়সী প্রশংসা করেন আর বলেন যে, এই বালকের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী উম্মতগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন; যার উল্লেখ ইঞ্জিল কিতাবে বিদ্যমান (জামি, ২০০০: ১২৮)।

নাস্তরা সন্ন্যাসীর ঈমান আনার আকাঙ্ক্ষা

পঁচিশ বছর বয়সে নবি করিম (সা.) হযরত খাদিজার (র.) সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এর আগেই তিনি হযরত খাদিজার (র.) ব্যবসায়িক প্রতিনিধি হিসাবে খাদিজার (র.) গোলাম মায়সারাকে সাথে নিয়ে সিরিয়া সফরে যেতেন। মওলানা জামি (র.) এ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে, সিরিয়ার উপকণ্ঠে বুশরা শহরে নাস্তরা নামক জনৈক সন্ন্যাসী হযরতের ওপর ঈমান আনয়নের আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঘটনার বিবরণ দিয়ে মওলানা জামি (র.) বলেন, বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মায়সারাকে নিয়ে সিরিয়া যাবার পথে বুশরা উপশহরে পৌঁছে তারা একটি বৃক্ষের নিচে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য বসলেন। বৃক্ষটি ছিল নাস্তরা সন্ন্যাসীর আস্তানার পার্শ্বে। নাস্তরা মায়সারাকে চিনতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বৃক্ষের নিচে উপবিষ্ট এই লোকটি কে? মায়সারা বললেন, ইনি কুরাইশ গোত্রের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং বণি হাশেমের একজন বিশিষ্ট যুবক। নাস্তরা বললেন: সত্য কথা এই যে, এই বৃক্ষের নিচে পয়গাম্বর ছাড়া অন্য কেউ বসে নাই। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, কোনরূপ ব্যথা ছাড়াই তার চোখে যে লালিমা রয়েছে এটা কি সব সময়ই থাকে? মায়সারা বললেন, হ্যাঁ। নাস্তরা কসম খেয়ে বললেন, ইনি শেষ জামানার পয়গাম্বর,

সর্বশেষ নবি। হায়, আমি যদি তার নবুয়াত প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত জীবিত থেকে ইসলামে প্রবেশ করে তাঁর অনুসরণ করতে পারতাম।

নবিজির (স.) উট চালকরূপে জিব্রাঈল (আ.)

নবুয়াত লাভের আগেকার ঘটনা। হযরত তখন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় যাতায়াত করছেন। একবার বাণিজ্য কাফেলায় আবুবকর সিদ্দিক (র.) ও আবু জাহল প্রমূখও ছিল। মওলানা জামি (র.) এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ফিরতি কাফেলা মাররুয জাহরানে পৌঁছার পর আবুবকর সিদ্দিক (র.) মায়সারাকে বললেন, কাফেলা ফিরে আসার সুসংবাদ নিয়ে মুহম্মদ (স.)-কে খাদিজার (র.) কাছে পাঠিয়ে দাও। মায়সারা প্রস্তাবটি মেনে নিলেন। যখন মুহাম্মদকে (স.) প্রেরণ করা হলো তখন আবু জাহল বলতে লাগল, মায়সারা! মুহাম্মদ তো এখনো অপক্ক বালক। সে ভুল পথে যেতে পারে। তার পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রেরণ কর। মায়সারা বললেন, বয়সে ছোট হলেও তিনি বুদ্ধিমত্তায় বড়। সে মতে মহানবি (স.) রওনা হলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর ঘটনাক্রমে তিনি উটের ওপর ঘুমিয়ে পড়লেন। ফলে উট বিপথগামী হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা হযরত জিব্রাঈলকে (আ.) আদেশ দিলেন : উটের লাগাম ধরে তাকে সোজা পথে তুলে দিন এবং তিন দিনের পথ একদিনে অতিক্রম করিয়ে দিন। জিব্রাঈল (আ.) তাই করলেন। আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত এরশাদে এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

'আল্লাহ আপনাকে পথ হারা অবস্থায় পেলেন, অতঃপর পথে তুলে দিলেন (আল কুরআন, ৯৩:৭)।

নবিজি (স.) সেদিনই খাদিজার (র.) কাছে চিঠিখানা পৌঁছে দিয়ে কাফেলার সাথে মিলিত হবার জন্য রওনা হলেন। আবু জাহল দূর থেকে দেখে বিজয়ের আনন্দে বলে উঠল, বলেছিলাম না মুহাম্মদ পথ ভুলে যাবে। কিন্তু মুহাম্মদ (স.) খাদিজার (র.) জবাবপত্র হস্তান্তর করলেন। তখন শরম ও লজ্জায় আবু জাহলের মুখ কালো হয়ে গেল (জামি, ২০০০:১৩০)।

মওলানা জামি (র.) এ ঘটনার বর্ণনায় যথার্থই এর শিরোনাম দিয়েছেন মহানবির উট চালকরূপে জিব্রাঈল (আ.)। আরো প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, মওলানা জামি (র.) এ ঘটনাকে সুরা ওয়াদ্দোহায় 'আমি আপনাকে পথ ভোলা অবস্থায় পেয়েছিলাম। অতঃপর পথে তুলে দিলাম আয়াতের প্রেক্ষিত বলে উল্লেখ করেছেন।

ঘরের মানিক খুঁজিয়া বেড়ানো

নবি করিম (স.) এর আবির্ভাবকালে সারা দুনিয়ায় যেমন নতুন শিহরণ জেগেছিল তেমনি সত্য সন্ধানী মানুষেরা নবি করিম (স.) এর সান্নিধ্য লাভের জন্য পাগলপারা হয়ে ঘুরছিলেন। এমনকি অনেকে ঘরের মানিক বাইরে খুঁজে বেড়ানোর মত সংগ্রাম সাধনাও করছিলেন। মওলানা জামি (র.) এ রকম একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,

যায়েদ ইবনে আমর ও ওয়ারাকা ইবনে নওফেল উভয়ই সত্য ধর্মের সন্ধানে দূর দূরান্তের দেশ সফর করেন। এক পর্যায়ে তারা মূসেলের এক খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে যান। সেখানে ওয়ারাকা ইবনে নওফেল খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলেন। কিন্তু যায়েদকে খ্রিষ্টধর্ম প্রভাবিত করতে পারল না। তিনি সেখান থেকে অন্য এক সন্ন্যাসীর আস্তানায় উপস্থিত হলেন। সন্ন্যাসী তাকে প্রশ্ন করলেন, কোথেকে এসেছ? যায়েদ বললেন, মক্কার হেরেম শরীফ থেকে, যার ভিত্তি হযরত ইব্রাহীম (আ.) স্থাপন করেছিলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কেন এসেছ? তিনি বললেন, সত্য ধর্মের খোঁজে। সন্ন্যাসী বললো, তার আবির্ভাব আসন্ন। তোমাদের ভূখণ্ডেই তার আবির্ভাব হবে।

মওলানা জামি (র.) আরো উল্লেখ করেছেন যে, তাওহিদ, আল্লাহর পবিত্রতা, ঈমান ও কিয়ামত দিবসের ওপর উক্ত সন্ন্যাসীর অনেক কবিতা রচিত। রাসুলুল্লাহর (স.) আবির্ভাবের পূর্বে তাকে হত্যা করা হয় (জামি, ২০০০: ১৩৪)।

আকসাম ইবনে সাইফির মুখে রাসুলুল্লাহর (স.) গুণগান

নবিকরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সময়কালের ঘটনা। জাহেলি যুগের প্রসিদ্ধ বাগী সর্দার আকসাম ইবনে সাইফি নামক এক ব্যক্তি আল্লাহর নবির সাক্ষাত লাভের বাসনা পোষণ করেন। কিন্তু তার কওমের লোকেরা সর্দারের এমন উদ্যোগ মানহানিকর মনে করে তাকে আসতে বাধা দিল। অতপর তিনি দু'জন লোককে নবিজি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠান। তারা ফিরে গিয়ে সংগৃহীত তথ্য জানালে তিনি আপন কওমকে সবার আগে ঈমান আনার উপদেশ দিলেন। কেননা তার দৃষ্টিতে সেই হবে সবচেয়ে সম্মানিত, যে সবার আগে রাসুলুল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। এর কিছুদিন পর লোকটি মারা যায়। মওলানা জামি (র.) এ ঘটনা উপস্থাপন করে রসূলুল্লাহ (স.) এর প্রশংসায় একথা প্রমাণ করেছেন যে, জগতের সত্য সন্ধানী মানুষ নবিজির (স.) কদমে লুটিয়ে পড়ার জন্য আকুল ছিলেন।

উমাইয়া ইবনে আবুস সালাত এর ভাগ্য বিড়ম্বনা

মওলানা জামি (র.) আরেক বিজ্ঞ লোকের দীর্ঘ ইতিহাস উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন যে, নবিকরিম (স.) এর প্রশংসা ও মহত্বের জ্ঞান সবার হৃদয়ে গ্রথিত থাকলেও শয়তানের কুমন্ত্রণায় মানুষ বড় ধরনের ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার হয়। যুগে যুগে জ্ঞানী মনীষীগণ নবিজির (স.) দ্বীন ও আদর্শ গ্রহণ থেকে বিমুখ কেন বা কিভাবে থাকতে পারে, তার জবাব মিলবে এই ঘটনায় । কাহিনীর শুরুতে আবু সুফিয়ান এর বর্ণনা মোতাবেক উমাইয়া ইবনে আবুস সালত নামক এক ব্যক্তি তার কাছে মক্কা নিবাসী ওতবা ইবনে রাবিয়ার চরিত্র ও অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। ওতবা বয়স্ক লোক বলে জানতে পেরে সে খুলে বলল যে, যে ব্যক্তির বয়স চল্লিশ বছর অতিক্রম করে গেছে; অথচ এর মধ্যে নবুয়াত পায় নি, সে আর নবি হতে পারে না। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পুনরায় সিরিয়া গিয়ে আবু সুফিয়ান পরিহাস ছলে ওতবাকে যখন বলল যে, তোমার কথিত নবির আর্বিভাব হয়েছে। তাদের আলাপচারিতায় আবুস সালত বলল যে, স্ব গোত্রের কাছে লজ্জার ভয়ে সে আবদে মোনাফ গোত্রের নবির প্রতি ঈমান আনতে পারছে না। মওলানা জামি (র.) বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া ইবনে আবুস সালাত হুজুর (স.) এর খেদমতে হাজির হয়ে স্তুতিগাঁথা পাঠ করে। সে প্রথমে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গুণ বর্ণনা করে। এরপর সকল পয়গম্বরের অবস্থা বর্ণনা করে। স্তুতিগাঁথার উপসংহারে হুজুর (স.) এর প্রশংসা করত: তাঁর রেসালাত সত্য বলে ঘোষণা করে। হুজুর (স.) তাকে একবার সূরা তোয়া-হা পাঠ করে শোনান। সে বলল যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এটা মানুষের কালাম নয়। কিন্তু আমি আমার ভাই বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করতে পারি না।

জামির (র.) বর্ণনা অনুযায়ী এরপর সে দ্রুত সিরিয়া ফিরে যায়। সন্ন্যাসীদের মাঝে নবিজির (স.) সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। সবাই তাকে ঈমান আনয়নের জন্যে উৎসাহ যোগায়। সে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসে। এরই মধ্যে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে কুরাইশ সর্দাররা নিহত হয়। আবুস সালত বলে যে, নাহ্, ইনি নবি হলে আপন কওমের সর্দারদের হত্যা করতেন না। এরপর সে কুরাইশ সর্দারদের জন্যে শোকগাঁথা রচনা করে। এরইমধ্যে সে একটি বিদঘুটে স্বপ্ন দেখল। তারপর কবি আল জাযাহ এর সান্নিধ্যে চলে গেল। সে পাখিদের বুলি বুঝত। একদিন আবুস সালত কবি আল জাযাহ এর সঙ্গে মদ্যপানের অপেক্ষায় ছিল। এমন সময় একটি কাক এসে কাকা করতে লাগল। তাতে আবুস সালাত এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আল জাযাহ জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি হল? আবুস সালত বলল! এই কাক যা বলছে তা সত্য হলে আমি শরাব হাতে আসার আগেই মারা যাব। আল জাযাহ

তার বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য তাকে দ্রুত শরাব দিল। কিন্তু শরাব যখন তার সঙ্গে উপবিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌঁছল অমনি আবুস সালত জ্ঞান হারিয়ে ভূতলশায়ী হল। আল জাযাহ তাকে কাপড় ঢেকে দিল। কিছুক্ষণ পর কাপড় সরিয়ে দেখা গেল যে, তার প্রাণ দেহপিঞ্জর ছেড়েচলে গেছে (জামি, ২০০০: ১৪৩)।

রাসুলকে (স.) না দেখেই এক বৃদ্ধের ঈমান আনয়ন

মওলানা জামি (র.) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ সূত্রে আসকালান ইবনে আবুল আওয়ালিম নামক ইয়ামেনের এক বৃদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করেন। যিনি না দেখেই হযরতের (স.) প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর কাছে কয়েক পংক্তি কবিতা উপহার পাঠান।

اشهد بالله ذي المعالى و فاق الليل بالصباح
اشهد بالله رب موسى النگ ارسلت بالبطاح
فكن شفيعى الى مايک بدع البرايا الى الصلاح

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ যখন হযরত আবু বকর (র.) এর মাধ্যমে হযরতের (স.) সাক্ষাত লাভে ধন্য হন, তখন তিনি হযরত খাদিজার (র.) ঘরে অবস্থান করছিলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ সহজে হযরতের প্রতি ঈমান আনেন এবং ঐ বৃদ্ধের কথা হযরতকে (স.) জানান। তাতে রাসুল পাকের (স.) পবিত্র জবান হতে এমন সুসংবাদ লাভ করেন, যা আমাদের সবার জন্য পরম সৌভাগ্য ও সওগাত। যে সুসংবাদ হল :

رب مؤمن بى و ما رانى و مصدق بى و ما شهد زمانى اولئک حقا اخوانى

"আমার প্রতি ঈমানদার অনেক লোক আছে, তারা আমাকে দেখে নি। এমন অনেকে আছে যারা আমাকে সত্য নবি হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ আমার সময়কাল পায়নি। এরাই আমার সত্যিকার ভাই (জামি, ২০০০:১৪৪)।

আলেকজান্দ্রিয়ার পাদ্রী কর্তৃক নবিজির (স.) প্রশংসা

মওলানা আব্দুর রহমান জামি (র.) শাওয়াহেদুন নবুয়াত গ্রন্থে মুগীরা ইবনে শো'বা (র.)- এর বাচনিক এক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত (স.) এর আবির্ভাবের সময়কালে আমি তায়েফের

ব্যবসায়ীদের একটি দলের সাথে আলেকজান্দ্রিয়ায় গেলাম, সেথায় এক বড় পাদ্রী ছিল। সে সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকত। লোকেরা রোগীদের তার কাছে নিয়ে গিয়ে দোয়া চাইত এবং সুস্থতা লাভ করত। আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, পয়গাম্বরদের মধ্যে আগমন করেন নি, এমন কেউ বাকি আছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, একজন বাকি আছেন। তিনিই হবেন সর্বশেষ পয়গাম্বর তাঁর ও ঈসার (আ.) মাঝখানে সময়ের ব্যবধান খুব কমই হবে। তিনি না দীর্ঘদেহী হবেন, না বেটে হবেন এবং না অত্যধিক শ্বেতকায় হবেন, না কালো। তার চোখে লালিমা থাকবে এবং মাথার চুল লম্বা হবে। তার হাতে থাকবে তরবারী। তিনি যারই সম্মুখীন হবেন তাকে ভয় করবেন না।

তিনি নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন এবং তাঁর সহচরগণ তার জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন। তিনি 'কারতা' ভূমি থেকে বের হবেন এবং এক হেরেম থেকে অন্য হেরেমে হিজরত করবেন। তাঁর আবাসভূমি হবে পানিশূন্য মরুভূমি। এতে ঘাস উৎপন্ন হবে না। তিনি ইবরাহীমের (আ.) দ্বীনের অনুসারী হবেন। আমি (মুগীরা) বললাম, তাঁর গুণাবলী আরো কিছু বিস্তারিত বর্ণনা করুন। পাদ্রী বললেন, তিনি কোমরে কটিভূষণ বাঁধবেন। প্রত্যেক নবি কেবল তার নিজের জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন; অথচ তাঁর মসজিদ হবে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ। পানি সহজলভ্য না হলে তিনি তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করবেন।

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (র.) বলেন। এরপর আমি আলোকজান্দ্রিয়ার প্রত্যেক গির্জায় গেলাম এবং প্রত্যেক পাদ্রীকে হুর (স.) এর গুণাবলী জিজ্ঞাসা করলাম। তাদের প্রতিটি জাওয়ার মনে রেখে আমি মদিনায় ফিরে এলাম। এরপর সমস্ত ঘটনা হুজুর (স.) কে অবহিত করলাম। তিনি খুব আনন্দিত হলেন এবং এসব ঘটনা সাহাবায়ে কেরামকে (র.) শোনানোর জন্য ইচ্ছা করলেন। সে মতে আমি কয়েকদিন পর্যন্ত হুজুর (স.) এর খেদমতে হাজির হয়ে অনেককে সে কাহিনী শোনাতে থাকলাম (জামি, ২০০০: ১৪৬-১৪৭)।

নামাজে হামলা উদ্যত আবু জাহাল নাজেহাল হল

জামি (র.) রাসুলে পাক (স.)-এর বিরুদ্ধে কুরাইশ নেতাদের ষড়যন্ত্রের বহু ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত' গ্রন্থে। এসব ঘটনায় হযরতের প্রতি অলৌকিকভাবে গায়েবী সাহায্যের উদাহরণও পেশ করেছেন। এ ধরনের একটি ঘটনার বিবরণ এরূপ;

"একদিন আবু জাহল কুরাইশদের সঙ্গে ঝগড়া ও তর্কবিতর্কের এক পর্যায়ে কুরাইশদের লক্ষ্য করে বলল আমরা এই লোকটির (হযরত মুহাম্মদ স.-এর) কাজকর্ম নিয়ে বড় বেকায়দায় পড়েগেছি। খোদার

কসম আজকের দিনের পরে যদি দেখি যে, সে আগের নিয়মে নামাজ পড়ছে, তাহলে একটি পাথর নিয়ে তার মাথা ভেঙে দেব। যাতে তার দূরাচার হতে রক্ষা পাই। ঐ সময় তোমরা আমাকে সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে রাখতে বা আমাকে দুশমনের হাতে ন্যস্ত করতে পারবে না। তারা সবাই বড় বড় কসম খেয়ে বলল, আবুল হাকাম। কক্ষনো আমরা তোমাকে সাহায্য করা থেকে বিরত হব না। তোমাকে কিছুতেই দুশমনের হাতে তুলে দেব না। পরেরদিন ভোরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার নামাজের জায়গায় আসলেন তখন ঐ অভিশপ্ত, হাতে একটি পাথর তুলে নিল এবং হযরতের পেছনে পেছনে যেতে লাগল। হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজে দাঁড়ালেন তখন সে কাছাকাছি গেল। এ সময় তার অশুভ চেহারার রং বদলে গেল এবং দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে আসল। কুরাইশরা বলল কি হলো হে আবুল হাকাম? বলল, আল্লাহর কসম। ওর দিক থেকে একটা পাগলা উট আমার ওপর হামলে পড়েছিল। যে উটের পিঠের উঁচা চুটালীর মত চুটালী আমি কখনো দেখি নি। এবং এর মোটা তীক্ষ্ণ দাঁতের মতো দাঁতের কথা কখনো শুনি নি। যদি আরেকটু এগিয়ে আসত তাহলে আমাকে শেষ করে দিত।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন, সে যদি সেই উটের কাছে যেত তাহলে তাকে অবশ্যই পাকড়াও করত। জিব্রাইল (আ.) আমাকে এমনটি খবর দিয়েছিলেন।

হরিণীর নালিশ ও তাঁর সাথে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা বলা

জামি (র.) বলেন, যায়েদ ইবনে আকরাম (র.) বর্ণনা করেন যে, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিহ ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মদিনার একটি গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক বেদুইনের একটি তাবু চোখে পড়ল। তাবুটির সাথে একটি মাদী হরিণ বাধা ছিল। হরিণ, ডাক দিয়ে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এই বেদুইন আমাকে শিকার করে এনেছে। মরুভূমিতে আমার দুটি সন্তান আছে আর আমার স্তনে দুধ জমে আটকে আছে। সে আমাকে হত্যাও করছে না যে, এই কষ্ট থেকে রেহাই পাব। আর না আমাকে খোলা রাখছে, যাতে আমার সন্তানদের গিয়ে দুধ পান করাতে পারি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, তোমাকে যদি ছেড়ে দেই, তাহলে তুমি কি ফিরে আসবে? বলল, হ্যাঁ, আসব। যদি আমি ফিরে না আসি তাহলে আল্লাহ আমাকে আজাব দিবেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হরিণীকে ছেড়েদিলেন। বেশি সময় অতিক্রান্ত না হতেই হরিণী ফিরে আসল। তখন সে জিহবা দিয়ে নিজের ঠোঁট চাটতেছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হরিণীকে সেই তাবুর সাথে বেঁধে রাখলেন। হঠাৎ দেখলেন যে, বেদুইন লোকটি এক মশক পানি নিয়ে আসছে। রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুইনকে বললেন, হরিণটি কি বিক্রি দেবে? লোকটি বলল, এই হরিণ আপনার। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হরিণটিকে মুক্ত করে দিলেন। যায়েদ ইবনে আকরাম বলেন যে, আল্লাহর কসম হরিণটিকে দেখলাম যে, যেতে যেতে প্রান্তর ভূমিতে সে ডাক দিচ্ছিল আর বলছিল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (জামি, ২০০০: ২৩৬)।

আমাদের দেশে পুঁথিসাহিত্যে ও কবিগানের ধর্মীয় আসরের সূত্রে শিকারীর কাছে আটকা পড়া হরিণী রাসূলে পাককে (স.) জামিন রেখে দুগ্ধপোষ্য বাছুরদের দুধ পান করানোর বিস্ময়কর ঘটনার যে হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা লোকায়ত সাহিত্যে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে সেই ঘটনার মূল্যবান তথ্যসূত্র মওলানা জামির (র.) এই বর্ণনা। মওলানা জামি (র.) 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত' গ্রন্থে এ ধরনের আরো কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন।

দৈহিক গড়ন ও অঙ্গশৈষ্ট্যবে ছিলেন অনুপম

জামি (র.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দৈহিক সুন্দর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ গড়ন ও অঙ্গশৈষ্ট্যবের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন তার কবিতা ও গদ্য রচনায়। তন্মধ্যে শাওয়াহেদুন নবুয়াত' এর পঞ্চম রোকন (অধ্যায়)-এ উল্লেখ করেছেন যে, বাহ্যিক সৌন্দর্য, অঙ্গপ্রতঙ্গের সুসামঞ্জস্যতা ও শৈষ্ট্যব-সুষমা এমন ছিল যে, তার চাইতে অধিক উত্তম আর কিছু অকল্পনীয় ছিল- যা বহুসংখ্যক হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণিত।

হযরতের (স.) গুণাবলি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর পবিত্র দেহের গড়ন ছিল মাঝারি ধরনের উচ্চতায় ভারসাম্যপূর্ণ। এতদসত্ত্বেও লম্বা হিসাবে প্রসিদ্ধ কোন লোক যদি হযরতের (স.) সঙ্গে পথ চলত তাহলে হযরতকে (স.) তার চাইতে উচ্চ বলেই মনে হত।

তিনি যখন কথা বলতেন তখন এমন এক রোশনাই দেখা যেত, যা তাঁর পাত মোবারক হতে বিচ্ছুরিত হত। চতুর্দশী রাতে লোকেরা চাঁদের দিকে তাকাত। চাঁদের সৌন্দর্য তাঁর জগৎ উজালাকারী চেহারার মোকাবিলায় নিস্প্রাণ মনে হত। আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজরার মধ্যে একটা জিনিষ হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এমন সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর মোবারক নূরে হুজরা আলোকিত হয়ে গেল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর হারানো জিনিষ খুঁজে পেলেন।

নবিজির (স.) দৈহিক শক্তিমত্তা ছিল অসাধারণ

জামি (রহ.) রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক শক্তিমত্তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, হযরতের দৈহিক শক্তিমত্তা সবার চাইতে বেশি ছিল। তাঁর সময়কার সবচেয়ে বীর পাহলোয়ান ছিল রোকানা ৪৫। হযরত (স.) তার সঙ্গে কুস্তি ধরেন আর রোকানাকে ধরাশায়ী করেন। রোকানাকে তিনি যখন ইসলামের দাওয়াত দেন, এ ঘটনা সে সময়কার। রোকানার পিতা আবু রোকানাও ছিল জাহেলি যুগে সবচেয়ে শক্তিমান পাহলোয়ান। তাকেও তিনি ধরাশায়ী করেন। আবু রোকানা হযরতের সঙ্গে তিনবার কুস্তি ধরার প্রস্তাব দেয়। তিনবারেই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু রোকানাকে ধরাশায়ী করেন।

পথ চলার ভঙ্গি ছিল গতিময়

মওলানা জামি (র.) হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলার গতি ও ভঙ্গির প্রশংসায় লিখেছেন :

তিনি যখন পথ চলতেন কেউ তাঁর সঙ্গে কুলাত না (তিনি থাকতেন সবার চাইতে এগিয়ে)। আবু হুরায়রা (র.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে দ্রুত গতিতে পথ চলতে কাউকে দেখি নি। মাটি যেন তার পায়ের নিচে গুটিয়ে যেত। আমরা কষ্ট করে পথ চলতাম। তিনি বিনা কষ্টে চলতেন; অথচ তার সমান পর্যন্ত পৌঁছতাম না।

একই সাথে সামনে ও পশ্চাতে দেখতে পেতেন

মওলানা জামি (র.) হযরতের (স.) দৃষ্টিশক্তির অলৌকিকত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হযরতের (স.) চোখের দৃষ্টিশক্তি এমন ছিল যে, তিনি তার সম্মুখের দিক যেভাবে দেখতে পেতেন একই

সাথে পশ্চাত দিকও দেখতে পেতেন। অনুরূপভাবে তিনি আলোতে যেমন দেখতে পেতেন, অন্ধকারের মধ্যেও তদ্রুপ দেখতে পেতেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত সপ্তর্ষিমণ্ডল ১১টি তারকা দেখতে পেতেন (জামি, ২০০০: ২৮৬)।

হযরতের (স.) ভাষাজ্ঞান

জামি (র.) বলেন, হযরতের (স.) ভাষার বিশুদ্ধতা ও কথার সাবলীলতা ছিল অতুলনীয়। তিনি 'জাওয়ামেউল কালিম' (সংক্ষিপ্ত কথায় অনেক ভাবার্থ প্রকাশক) ও প্রজ্ঞায় অভিনবত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। আরবের সকল গোত্র ও তাদের উপজাতিদের ভাষা তিনি ভালভাবে জানতেন। প্রত্যেকের সাথে তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলতেন। যার ফলে অনেক সময় সাহাবায়ে কেরামের ওসব কথা বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ত। ফলে তারা ব্যাখ্যার জন্য অনুরোধ জানাতেন।

জ্ঞানের আধার চরিত্র সুষমায় অতুলনীয়

জামি (র.) হযরতের (স.) জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে, জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রজ্ঞায় হযরত (স.) এমন ছিলেন যে, কখনো কোনো মানুষ সেরূপ ছিল না। এর প্রমাণ হচ্ছে, তিনি যদিও 'উম্মী' নিরক্ষর ছিলেন ও কারো কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি; কিন্তু তার কার্যকলাপ, অবস্থাদি, চরিত্র ও আচার ব্যবহার এরূপ ছিল যে, কোনো মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সে পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। অনুরূপভাবে কারো শিক্ষাদান কিংবা কোনো বই পুস্তক অধ্যয়ন বা আহলে কিতাব (ইহুদী-খ্রিস্টান) ধর্মতাত্ত্বিকদের সঙ্গে ওঠাবসা ব্যতিরেকেই তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে এবং সকল আসমানী গ্রন্থে যা কিছু আছে তিনি জানতেন। একইভাবে জ্ঞানী মনীষীদের প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা ও পূর্ববর্তী উম্মতদের জীবনচরিত ভালভাবে জানতেন। প্রবাদবাক্যসমূহ, জন প্রশাসন, শরিয়ত ও বিধিবিধান প্রণয়ন, সুন্দর শিষ্টাচার ও প্রশংসনীয় চরিত্র আদর্শ তার মধ্যে এমনভাবে প্রকাশ পেত যে, তা হযরতের (স.) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পূর্ণতার সাক্ষ্যবহন করত। তাও এমনভাবে যে, তা মানবীয় শক্তির বাইরে বলে প্রতীয়মান হত। অনুরূপভাবে হযরতের (স.) যাবতীয় চরিত্র যেমন সহনশীলতা, ক্ষমা, দানশীলতা, বীরত্ব, লজ্জা, লোকজনের সঙ্গে সুন্দর সামাজিকতা এবং সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া, মায়া ও সংবেদনশীলতা, ওয়াদা পালন, আত্মীয়তা রক্ষা, বিনয়, ইনসাফ, আমানতদারী, পূত চরিত্র, সততা, সম্ভ্রম, ভদ্রতা, দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ, অল্পে তুষ্ট প্রভৃতি সুন্দর চরিত্র ও প্রশংসনীয় গুণাবলি তাঁর মধ্যে এমন ভারসাম্যপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল যে, তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু কল্পনার বাইরে ছিল। এর বিস্তৃত বিবরণ কিতাবসমূহে সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে।

খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তব রূপায়ণ

মাওলানা জামি (র.) নবিজির ওফাত লাভের পর প্রকাশিত বহু ঘটনাকে নবিজির নবুয়তের সাক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে সবচেয়েপ্রসিদ্ধ একটি ঘটনা হচ্ছে, হযরত (স.) যেভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন সে হিসেবে রাশেদার যুগের খলিফাগণ হযরতের স্থলাভিষিক্ত হন, যা হযরতের (স.) প্রতিটি উক্তি বাস্তব ও সত্য হওয়ার ঐতিহাসিক প্রমাণ । ঘটনাটি ছিল হযরত রাসুল (স.) এক ব্যক্তিকে কয়েক উটের বোঝাই খেজুর দান করেন। লোকটি এত বড় দান পাওয়ার পর বলল: ইয়া রাসুলালাহ। আমার ভয় হয়, আপনার অবর্তমানে কেউ আমাকে এই দান হয়ত প্রদান করবেন না। রাসুল (স.) বললেন: হয়ত দেবে। লোকটি বলল, কে দেবেন? রাসুল (স.) বললেন: আবুবকর। লোকটি এ কথা আমীরুল মু'মেনিন আলী (রা.) এর কাছে গিয়ে বলল। তিনি বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং জিজ্ঞাসা কর যে, আবুবকর(রা.) এর পরে আমাকে তা কে দেবেন? রাসুল (স.) বললেন যে, উমর ইবনে খাত্তাব দেবে। আমীরুল মু'মেনীন আলী (রা.) পুনরায় বললেন যে, গিয়ে জিজ্ঞেস কর উমরের (র.) পর কে প্রদান করবেন? রাসুল (স.) বললেন, ওসমান। একথা শোনার পর তিনি (আলী) নীরব হয়ে গেলেন (জামি, ২০০০: ২৯৩)। ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, রাসুলুলাহ (স.) এর পর যারা পর্যায়ক্রমে হযরতের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরা ছিলেন আবুবকর (র.), উমর (র.) ও ওসমান (র.)। অর্থাৎ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হযরতের ইঙ্গিত হুবহু বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছিল।

৫ম অধ্যায়

রাসুল (স.) এর বাণী ও পবিত্র কুরআনে আহলে বাইত

রাসুল (স.) এর বাণী ও পবিত্র কুরআনে আহলে বাইত

রাসুল প্রেমের পরিপূর্ণতার সাথে আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা অতোপ্রোতভাবে জড়িত। রাসুলে পাক (স.)-বলেছেন- الله الله اهل بيتى

অর্থাৎ তোমরা আমার আহলে বাইতের সর্ম্পকে সর্তকতা অবলম্বন করবে। কুরআন ও হাদিস শরিফে আহলে বাইতের মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তাারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াাসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যাক্তি আমার আহলে বাইতকে শত্রু মনে করবে বা তাদের প্রতি হিংসা করবে যে কেয়ামতের দিন ইয়াহুদী রূপে আসবে' (সুয়ুতি, ...:৭)।'

আহলে বাইত

আহল আল-বাইত (আরবি أَهْلُ الْبَيْتِ) বা আহলে বাইত (ফারসি: اهلِبیت; উর্দু: اہلبیت) একটি আরবি শব্দবন্ধ; যার শাব্দিক অর্থ ঘরের লোকজন। প্রাক-ইসলামি যুগে এই শব্দগুচ্ছটি আরব উপদ্বীপের গোত্র শাসক পরিবারের জন্য ব্যবহৃত হত। ইসলামি ঐতিহ্য অনুসারে আহল আল-বাইত দ্বারাইসলামের নবি মুহম্মদের পরিবার [ক] [১] এবং কিছুক্ষেত্রে তাঁর পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমকে বোঝানো হয়। [খ] শিয়া ইসলাম অনুসারে আহলে বাইত হলেন ইসলাম ও কোরআনের কেন্দ্রীয় ব্যাখ্যাকারী। শিয়া মুসলমানদের মতে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হলেন নবি মুহম্মদ (স.), তাঁর কন্যা ফাতিমা, তাঁর জামাতা আলী এবং তাঁদের সন্তান হাসান ও হুসেন, সম্মিলিতভাবে যাঁদের আহল আল-কিসা (চাদরাবৃত লোকেরা) বলা হয় আহল আল-বাইত ইসনা আশারিয়ারা বারো ইমামকে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত বলে বিশ্বাস করে; অন্যান্য শিয়া উপদলগুলো আলীর অন্য বংশধরদের উপর গুরুত্বারোপ করে; যেমন জায়েদিরা জায়েদ ইবনে আলীকে এবং ইসমাইলিরা ইসমাইল ইবনে জাফরকে অনুসরণ করে থাকে।

সুন্নি ইসলাম অনুসারে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হলেন নবি মুহম্মদ (স.), তাঁর স্ত্রীগণ, তাঁর কন্যা ফাতিমা, জয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, তাঁর চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী এবং তাঁর দৌহিত্র হাসান ও হুসে। কিছুক্ষেত্রে এই শব্দগুচ্ছটিকে মুহম্মদের চাচা আবু তালিব ও আব্বাসের বংশধর অবধি বিস্তৃত করা হয়। মালিক ইবনে আনাস ও আবু হানিফার মতে সমগ্র বনু হাশিম গোত্র আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।

কুরআনিক অর্থে নবীজি (সা.) এর আহলে বাইতের সদস্য ছিলেন চারজন; ফাতেমা (রা.), আলী (রা.), হাসান (রা.) ও হোসাইন (রা.)। মর্যাদার দিক থেকে তাঁরাই সবার উর্ধ্বে। নবীপত্নীরাও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'তারা বলল, তুমি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময়বোধ করছ? হে আহলে বাইত! তোমাদের ওপর সর্বদা আল্লাহর বিশেষ রহমত ও তাঁর অনুগ্রহ রয়েছে, নিশ্চয়ই তিনি মহাপ্রশংসিত ও মহামর্যাদাবান (১১:৭৩)।' এই আয়াতে ইব্রাহিম (আ.) এর পত্নীদের ব্যাপারে আহলে বাইত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাঁদের বিশেষ মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং শাব্দিক ও প্রায়োগিক অর্থে নবীপত্নীরাও আহলে বাইতের সদস্য।

নবি সংশ্লিষ্ট পরিবারের ব্যক্তির স্ত্রী-পুত্র, সন্তানসন্ততি, নিকটাত্মীয় স্বজনসহ পরিবারের সব সদস্যকেই তার আহলের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। কুরআন মাজিদে উল্লেখ হয়েছে, 'অতঃপর সে বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন "আহলে বাইত" এর সন্ধান দেব? যারা তোমাদের জন্য তাকে লালন পালন করবে এবং তারা তার শুভার্থী হবে (২৮:১২)।' এখানে মুসা (আ.) এর পরিবারকে আহলে বাইত বলা হয়েছে। সুতরাং রাসুলুল্লাহ (সা.) এর পরিবারের সদস্য, সব নিকটাত্মীয় ও আওলাদে রাসুলেরা আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

"বাইত" শব্দটি 'আবাসস্থল এবং বাসস্থান, তাবু এবং দালান উভয়ই'। গতানুগতিক ক্ষেত্রে এটি 'গৃহস্থলি' শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। আহল অর্থ পরিবার-স্বজন, আল অর্থ অনুগামী-অনুসারী। আল ও আহল শব্দদ্বয় কখনো সমার্থকরূপে, কখনো ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা দরুদ শরিফে বলি, 'আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ আপনি পরিপূর্ণ রহমত ও বরকত দান করুন হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি ও তাঁর স্বজনদের প্রতি। হাদিস শরিফে এসেছে, 'সকল খাঁটি বিশুদ্ধ বিশ্বাসী মুমিন আমার আল বা স্বজন' (আহমাদ)।

হজরত নুহ (আ.) এর ঔরসজাত সন্তানও কর্মদোষে আল বা আহল হতে পারেননি। কোরআনের বর্ণনা, 'নুহ (আ.) তাঁর রবকে আহ্বান করে বললেন, 'নিশ্চয়ই সে আমার পুত্র-আমার আহল আর আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আপনি সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক। বললেন, হে নুহ! নিশ্চয়ই সে আপনার আহল নয়, কারণ তার কর্ম সঠিক নয় (১১:৪৬)।'

কোনো ব্যক্তির 'আহল আল-বাইত' বলতে তার পরিবারের সকল সদস্য এবং তার পরিবারের সাথে বসবাসকারী সকলকে নির্দেশ করে। আহলে বাইত মূলত তার কুরআন অর্থে ব্যবহৃত হয়, "আহলুল বাইত" শব্দটি পরিবারের সদস্য ও স্ত্রীকে ভদ্রভাবে সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

আহল আল-বাইত শব্দটি কোরআন-এ দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে 'স্ত্রী' শব্দটির স্থলে। প্রথমটি মুহাম্মদ নবির স্ত্রীদের নির্দেশ করেছে [কুরআন ৩৩:৩৩] এবং পরেরটি ইব্রাহীম নবির স্ত্রী সারাকে নির্দেশ করেছে (আল কুরআন ১১:৭৩)। কিছু অনুবাদকের মতানুসারে, কুরআন-এ "আল-কুরবা" শব্দটি দ্বারা 'আহল আল-বাইত' শব্দটিকে ৪২:২৩ বোঝানো হয়েছে।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে , মহানবি (স.)-এর শেষ বাণী যা তিনি বিদায় হজে একলক্ষ বিশ হাজার সাহাবিদের মাঝে এরশাদ করেছিলেন:"হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের মধ্যে দু' টি সমপরিমাণ ভারি বস্তু রেখে যাচ্ছি যদি এ দু' টিকে আঁকড়ে ধরে থাক (অনুসরণ কর) তাহলে কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। আর যদি একটিকে ছাড় তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। মহানবি (স.) সাহাবাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ,"এখানে উপস্থিত লোকদের উচিত অনুপস্থিত সকলে কাছে আমার এই বাণী পৌছিয়ে দেয়া, কেননা যাদের কাছে পৌছানো হবে , তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন আছে যে, শ্রবণকারীর চাইতে সংরক্ষণের দিক থেকে অধিকযোগ্য। আর তোমরা যেন আমার পরে কাফের হয়ে যেও না।

মহানবি (স.) নির্দেশ দিয়েছেন যে,"আহলে বাইত-এর আগ যাওয়ার চেষ্টা করোনা তাহলে ধ্বংস হয় যাবে। তাদের থেকে সরে যেয়েনা তাহলে দুঃখ কষ্ট তোমাদের চির সাথী হয় যাব। তাদেরকে শিক্ষা দওয়ার চেষ্টা করানা তাঁরা তোমাদের থেকে বেশি জ্ঞানী।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি স্বীয় তাফসীরে লিখেছেন যে , আহলে বাইত-এর কথা এজন্য তাগিদ করেছেন যে ,"হেদায়েত এবং বেলায়েতের ব্যাপারে আহলে বাইতই পথপ্রদর্শক। তাঁদের উসিলা ব্যতিত কেউ আল্লাহর ওলির মর্তবায় পৌছাতে পারবে না। আহলে বাইত-এর মধ্যে সর্বপ্রথম রয়েছেন হযরত আলী (আঃ) অতঃপর তাঁর সন্তানদের মধ্যে হযরত হাসান আসকারী পর্যন্ত, এই সিলসিলা অব্যাহত থাকবে।

কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে , আহলে বাইত (আঃ)-এর এই সহীহ্ হাদীসটিতে আহলে বাইত কে বাদ দিয়ে ,' সুন্নাহ ' ও' হাদীস ' শব্দ যোগ করা হয়েছে, যেমন, বিদায় হজে রাসূল (স.)'কোরআন ও সুন্নাহ বা হাদীস ' রেখে যাবার কথা বলেছেন বলে প্রচার করা হয়। অথচ এটা সঠিক নয়! কিছু দরবারি আলেমরা অনেকভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন, যেমন, তারা বলেন , মহানবী (স.) নাকি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ভাষণ দিয়েছেন যেমন, কোথাও "কোরআন ও সুন্নাহ " বলেছেন , আবার

কোথাও,"কোরআন ও হাদীস" বলেছেন, যখন আমি বললাম ঠিক আছে সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেখাতে পারবেন। তখন আর সদুত্তর আসে না, আমি পাঠকদের অবগতির জন্য প্রমাণ স্বরূপ বলছি,"কোরআন ও সুন্নাহ বা হাদীস" এই হাদীসটি মুয়াত্তা ইমাম মালেক তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন মুরসাল হাদীস হিসাবে সেখানে সাহাবির ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন।"

দুটি ভারী বস্তুর হাদিস

দুটি ভারী বস্তুর হাদিস বা হাদিসে সাকালাইন (আরবি: حديث الثقلين, প্রতিবর্ণী. Hadith at-Thaqalayn) বলতে ইসলামের নবি মুহাম্মদের একটি উক্তিকে (হাদিস) বোঝায়। মুহাম্মদের হাদিস অনুসারে কুরআন ও আহলে বাইতকে ("বাড়ির লোক", মুহাম্মদের পরিবার) দুটি ভারী জিনিস হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। এই হাদিস প্রসঙ্গে মুহাম্মদের পরিবার আলী, ফাতিমা (মুহাম্মদের কন্যা) এবং তাদের দুই সন্তান (হাসান ও হুসাইন) ও তাদের বংশধরকে বোঝায়। এই হাদীসটি শিয়া ও সুন্নি উভয় সূত্রে ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী "খুম্ম" নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও সানা বর্ণনা শেষে ওয়াজ-নসীহত করলেন। তারপর বললেন, সাবধান, হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরিশতা আসবে, আর আমিও তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো, আল্লাহর কিতাব। এতে হিদায়াত এবং নূর রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অবলম্বন কর, একে শক্ত করে ধরে রাখো। এরপর কুরআনের প্রতি আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন। আর দ্বিতীয়টি হলো আমার আহলে বাইত। আর আমি আহলে বাইতর ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

আহলে বাইতে রাসুল (সা.) এর মর্যাদা

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে নবি! আপনি আপনার উম্মতদের বলে দিন, আমি আমার দাওয়াতের বিনিময়ে আমার আহলে বাইতদের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই চাই না (২:২৩)।’ ‘হে আহলে বাইত! আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে (৩৩:৩৩)।’ নবিপত্নী উম্মে সালমা (রা.) বলেন, ‘যখন আমার গৃহে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল, তখন আল্লাহর রাসুল (সা.) ফাতেমা, আলী, হাসান ও হুসাইনকে চাদরাবৃত করে বললেন, হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বাইত।’

আহলে বাইতে রাসুল (সা.) এর সম্মান

গাদিরে খুমের ভাষণে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন: ‘আমি তোমাদের জন্য অতি মূল্যবান দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, একটি আল্লাহর কিতাব, অপরটি হচ্ছে আমার রক্তসম্পর্কীয় নিকট স্বজন “আহলে বাইত”। তোমরা যদি এ দুটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।’

আওলাদে রাসুল (সা.) ও সাইয়্যেদের পরিচয় ও মহত্ত্ব

আওলাদে রাসুল (সা.) এর অর্থ রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সন্তান বা বংশধর। তাঁরা বিশেষ সম্মানের অধিকারী। আওলাদে রাসুল মানে আহলে বাইত নয়। নবি করিম (সা.) এর বংশধরেরা সাইয়্যেদ নামে পরিচিত। তাঁরা আওলাদে রাসুল (সা.) এর অন্তর্ভুক্ত। ঈমান, আমল ও তাকওয়াই মর্যাদার মাপকাঠি।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মানব! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে, অতঃপর তোমাদিগকে বিভিন্ন শাখা ও গোত্রে বিভাজন করেছি, যাতে তোমরা পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের সেই বেশি সম্মানিত, যে বেশি তাকওয়াবান (৪৯:১৩)।’

কারবালার শিক্ষা

মহররম মাস আসবে প্রতিটি বছর ঘুরে, আশুরা আসবে বারবার ঘুরেফিরে, কারবালা আসবে প্রতিটি সংকট মুহূর্তে। হজরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর ফোরাত নদীর তীরে কারবালার প্রান্তরে আত্মদান মূলত অসত্য, অসুন্দর, অন্যায় ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে সত্য, সুন্দর, ন্যায় ও কল্যাণের অনন্তকালের জন্য আদর্শিক বিজয়ের শিক্ষা। কারবালার শিক্ষা অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের শিক্ষা। মহানবি (সা.) বলেন, ‘জালিম শাসকের সম্মুখে হক কথা বলা উত্তম জিহাদ’ (বুখারি ও তিরমিজি)।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

জামি (র.) কাব্যে আহলে বাইত এর প্রশস্তি ও স্বরূপ

জামি (র.) কাব্যে আহলে বাইত এর প্রশস্তি ও স্বরূপ

রাসুল প্রেমের সাথে সাথে মাওলানা জামি আহলে বাইতের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও প্রদর্শন করেছেন। মওলানা জামি (র.) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ সূত্রে আসকালান ইবনে আবুল আওয়ালিম নামক ইয়ামেনের এক বৃদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করেন। যিনি না দেখেই হযরতের (স.) প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর কাছে কয়েক পংক্তি কবিতা উপহার পাঠান।

أشهد بالله رب موسى النگ ارسلت بالبطاح

فكن شفيعى الى مايک بدع البرايا الى الصلاح

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ যখন হযরত আবুবকর (রা.) এর মাধ্যমে হযরতের (স.) সাক্ষাত লাভে ধন্য হন, তখন তিনি হযরত খাদিজার (র.) ঘরে অবস্থান করছিলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ সহজে হযরতের প্রতি ঈমান আনেন এবং ঐ বৃদ্ধের কথা হযরতকে (স.) জানান। তাতে রাসুল পাকের (স.) পবিত্র জবান হতে এমন সুসংবাদ লাভ করেন, যা আমাদের সবার জন্য পরম সৌভাগ্য ও সওগাত। যে সুসংবাদ হল,

رب مؤمن بى و ما رانى و مصدق بى و ما شهد زمانى اولئک حقا اخوانى

"আমার প্রতি ঈমানদার অনেক লোক আছে, তারা আমাকে দেখে নি। এমন অনেকে আছে যারা আমাকে সত্য নবি হিসেবে গ্রহণ করেছে অথচ আমার সময়কাল পায়নি। এরাই আমার সত্যিকার ভাই (জামি, ২০০০: ৩২৩)। মওলানা জামি (র.) এ ঘটনা উপস্থাপন করে রসূলুল্লাহ (স.) এর প্রশংসায় একথা প্রমাণ করেছেন যে, জগতের সত্য সন্ধানী মানুষ নবীজির (স.) কদমে লুটিয়ে পড়ার জন্য আকুল ছিলেন।

'শাওয়াহেদুন নবুয়াত'। কিতাবটিতে রাসুল (স.) এর প্রেম ও আহলে বাইত (রাসূলে পাক (স.) এর বংশধর) সম্পর্কে ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। ইসলামের প্রথম চার খলিফার প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে ইসলামের চারটি মূল স্তম্ভ বলে বর্ণনা করেছেন আর বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী তথা আশারা মুবাশশরা ও অন্যান্য সাহাবীদের প্রশংসা করছেন ।

এই গ্রন্থটিতে হযরত (স.) এর নবুওয়াতের আগে, হিজরতের পরে ও ওফাতের আগে পরে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাবলি, আহলে বাইতের ইমামগণ, খোলাফায়ে রাশেদীন, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনদের জীবন চরিতও আলোচিত হয়েছে; যা প্রকারান্তরে রাসূলে পাকের নবুওয়াতের প্রমাণপঞ্জির

অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাদের মাধ্যমে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাবলিও মূলত হযরত (স.) এর বদৌলতেই সংঘটিত হয়েছে।

নবিজি (স.) উলুল আ'যম রাসুল

প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নবি রাসুলদের (আ.) মাঝে শ্রেষ্ঠ ও সবার শিরোমণি এক কথায়- 'উলুল আ'জম রাসুল"(অতীব উচ্চ সংকল্পধারী রাসুল)। মওলানা জামি (র) এই অভিধাটির ব্যখ্যা দিয়েছেন 'শাওয়াহেদুন নবুওয়াতের' সূচনালগ্নে ভূমিকায়। মুহিউদ্দিন আরাবি রচিত ফতুহাতে মক্কিয়ার চতুর্দশ অধ্যায়ের বরাতে নবি ও রাসূলের অর্থ সম্পর্কিত এ ব্যাখ্যাটি হৃদয়গ্রাহী ও প্রণিধা যোগ্য।

'ফতুহাতে মক্কীয়া'র বর্ণনা মতে নবি তিনি, যাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমে শরিয়ত প্রদান করা হয়। এই শরিয়তের অনুসরণ স্বয়ং তার জন্যও অপরিহার্য হয়ে থাকে। যদি তিনি শরিয়াসহ অন্য লোকদের প্রতি প্রেরিত হন তবে তাঁকে বলা হয় রাসুল। 'উলুল আযম' (উচ্চ সংকল্প ও ক্ষমতাশালী) রাসুল তিনি, যিনি রেসালাত প্রচারের পর ঈমান আনতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হন। কেননা, নিছক নবুয়াত ও রেসালাতে জিহাদ ও যুদ্ধ করা শর্ত নয় (জামি, ২০০০: ৮১)।

মওলানা জামি (র.) এ পর্যায়ে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবনের শুরুতে নিছক তাবলীগ ও দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব ও পরবর্তীকালে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও লড়াইয়ের জন্য আদিষ্ট হওয়ার বিধানসমূহ প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেন। বস্তুত আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন 'উলুল আয়ন রাসুল'- যিনি নবুয়াত ও রেসালাতের দায়িত্বের একই সঙ্গে অবাধ্য কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও পরিচালনা করেন (জামি, ২০০০: ৮১)।

মা আমেনার নয়নমণি

মদিনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে মা আমেনা অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিশু নবি (স.) জননীর শিয়রে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ তার জননী সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর তিনি পুত্রের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন। জগতের ধ্বংসশীল। প্রত্যেক নতুন পুরাতন হবে। আমি মারা গেলেও আমার স্মৃতি অমর হয়ে থাকলে। কেননা, আমি একজন পবিত্র ও মহানুভব ব্যক্তিত্বকে জন্ম দিয়েছি এবং একটি উজ্জ্বল স্মৃতি ছেড়ে যাচ্ছি (খান অনু. ২০০৭: ৪৮)।

بارک الله فیک من غلام ان صح ما ابصرت في المنام
فانت مبعوث الی الانام من عند ذی ما ابصرت فی المنام

তাঁর পদচিহ্ন ছিল ইব্রাহীম (আ.) এর পদচিহ্নের অনুরূপ

আরবরা যেসব জ্ঞানে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিল তন্মধ্যে একটি ছিল পদচিহ্ন জ্ঞান। হিজরতের সময় পাথুরে জমিনে পদচিহ্ন অনুসরণ করে সন্ধানী কাফেররা সৌর পর্বতের গুহার মুখ পর্যন্ত হযরতকে খোঁজ করতে যাবার ইতিহাস আমরা পড়েছি। শৈশবেও শিশুনবির পদচিহ্ন দেখে। তার নবি হওয়ার পূর্বাভাস লাভের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন মওলানা জামি (র.) শাওয়াহেদুন নবুয়াত' গ্রন্থে। তিনি প্রমাণ দেখান যে, শিশুনবির (স.) পদচিহ্ন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পদচিহ্নের অনুরূপ ছিল।
বণি মুদাল্লাজের কয়েকজন লোকের বরাতে তিনি বলেন যে, শিশু নবির (স.) পদচিহ্ন কাবাঘরের সম্মুখে রক্ষিত মাকামে ইব্রাহীমের পদচিহ্নের হুবহু সাদৃশ্যপূর্ণ। মওলানা জামি (র.) হযরতের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের বসার কক্ষে নাজরানের খ্রিস্টান পাদ্রীর আগমন এবং খেলায়রত শিশু মুহাম্মদকে (স.) দেখে তার মায়াভরা দুই চোখ, বরকতময় পৃষ্ঠদেশ ও ভাগ্যবিজড়িত পদযুগল নিরীক্ষণের পর শিশুকে হেফাজত করে গড়ে তোলার জন্য পাদ্রীর সুপারিশের বিবরণ তুলে ধরেন (জামি, ২০০০: ১২৬)।

বংশের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক শিশু মুহাম্মদের (স.) প্রশংসা

পিতা ও মাতার ইন্তিকালের পর শিশু নবি মুহাম্মদ (স.) এর প্রতিপালনের ভার নিয়েছিলেন দাদা আবু মুত্তালিব। তিনি কুরাইশদের সর্দার ছিলেন। শিশু নবির (স.) চেহারা, শরীর ও আদুরে চালচলন আর নানা ঘটনার কারণে তার মনে প্রতীতি জন্মেছিল যে, এই শিশু ভবিষ্যতে কওমের সর্দার হবে। পুত্র আবু তালেবকে তাই বারবার সুপারিশ করতেন, ভবিষ্যতে তার যত্ন নেয়ার জন্য। শৈশবে দাদা আব্দুল মুত্তালিব নাতিকে কিভাবে সম্মান দিয়েছেন আর প্রশংসা করেছেন। মওলানা জামি (র.) তার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত' গ্রন্থে। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (র.) বর্ণনা করেন যে, আব্দুল মুত্তালিবের জন্য কাবাগৃহের ছায়াতলে একটি কুরসি স্থাপন করা হয়েছিল। তার সম্মানার্থে সেখানে এক ব্যক্তি মোতায়েন থাকত। মহানবি (স.) শৈশবে সেই কুরসির ওপর এসে বসতে

চাইতেন। তখন চাচা আবু তালেব তাঁকে বসার অনুমতি দিতেন না। আব্দুল মুত্তালিব বলতেন, আমার বৎসকে ডাক। আল্লাহর কসম তার মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ, সে যেখানে ইচ্ছা বসতে পারবে। কারণ, তার সামনে রয়েছে বিরাট কাজ। আমার মনে হয়, সে কোনদিন তোমাদের সর্দার হবে। তার কপালে যে নূর রয়েছে তা সর্দার ও নেতা ছাড়া কারো ললাটে থাকতে পারে না। মওলানা জামি (র.) আরো বর্ণনা করেন যে, আব্দুল মুত্তালিব পৌত্রকে কাঁধে বসিয়ে কাবা শরীফ তওয়াফ করতেন এবং যখন টের পেতেন যে, তিনি প্রতিমাদের অপছন্দ করেন তখন তাঁকে প্রতিমাদের সামনে নিয়ে যেতেন না (জামি, ২০০০: ১২৬)।

খলিফাদের জীবন থেকে নবুয়াতের সাক্ষ্য

মওলানা জামি (র.) হযরতের (স.) খলিফা, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, তাবে তাবেয়িন, এমনকি পরবর্তী বুজুর্গগণের জীবনে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনা বা কারামতকেও রাসুলুল্লাহ (স.) এর নবুয়তের সাক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেননা, রাসূলের (স.) সাহচর্য বা শিক্ষার প্রভাব থেকেই তাদের জীবনে এই সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে। এ ধরনের একটি ঘটনা প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (র.) এর মৃত্যু ও দাফন সম্পর্কিত। জামি বলেন,মৃত্যুকালে আবুবকর (র.) ওসিয়ত করেছিলেন যে, আমার কফিন তোমরা রাসূলে করিম (স.) এর রওজার সামনে নিয়ে যাবে এবং বলবে 'আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ! এই আবুবকর সিদ্দিক আপনার দরবারে হাজির হয়েছে।' যদি এজাযত মিলে ও দরজা খুলে যায়, তাহলে প্রবেশ করাবে। অন্যথায় আমার লাশ বাকি'তে (কবরস্থানে) নিয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, যখন আবুবকরের ওসিয়ত অনুযায়ী আমল করা হল, তখন ঐ শব্দগুলো বলা শেষ হবার আগেই দরজার পর্দা সরে গেল এবং ভেতর থেকে আওয়াজ ভেসে আসল। আমরা সবাই এই আহবান শুনতে পেলাম যে, 'বন্ধুকে বন্ধুর কাছে নিয়ে এসো।' এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) হতেও একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন মাওলানা জামি (র.)। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (র.) বলেন যে, আবুবকর সিদ্দিক (র.) এর ইন্তেকালের পর কতক লোক বলল যে, তাঁকে শহিদগণের মাঝে নিয়ে দাফন করি। কেউ কেউ বলছিল যে, বাকি'তে (কবরস্থানে) নিয়ে দাফন করা হোক। আমি বললাম যে, আমার নিজ কামরায় আপন বন্ধুর পাশেই দাফন করব। আমরা এ বিষয় নিয়ে মতভেদ করছিলাম। তখন আমার ওপর নিদ্রা প্রবল হলে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম যে, কেউ বলছিল, 'বন্ধুকে বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও।' জাগ্রত হবার পর দেখলাম যে, সবাই সে আওয়ায় শুনতে পেয়েছে। এমনকি মসজিদে সমবেত লোকেরাও সে আওয়ায় শুনতে পেয়েছিল।'

উল্লেখ্য যে, নবি করিম (স.) এর ইন্তেকালের পর রাসুলকে (স.) হযরত আয়েশার (র.) কামরায় দাফন করা হয়। সে অনুযায়ী আবুবকুর সিদ্দিক (রা.)-কেনবিজির পাশে দাফন করা হয়। তবে নবিজির সম্মানার্থে আবুবকরের (র.) মাথা তাঁর কাঁধ বরাবর রেখে দাফন করা হয়। মদিনায় রওজা মোবারক জিয়ারতের সময় এখনো সবাই তাই হযরতের সমনে সালাম দেয়ার পর ডান দিকে একটু সরে গিয়ে আবুবকর সিদ্দিককে (র.) সালাম দেয়। তারপর একটু ডানে সরে গিয়ে হযরত উমর (রা.)-কে সালাম দেয়। কারণ, আবুবকরের (রা.) সন্মানার্থে তাঁকেও কাঁধ বরাবর সরিয়ে এনে দাফন করা হয়।

নবিজির (স.) প্রতি অবজ্ঞা পোষণকারীর শাস্তি

মাওলানা জামি (র.) নবিকরিম (স.) এর প্রশংসায় এমন কিছু ঘটনাবলির বর্ণনা দিয়েছেন। যে সব ঘটনায় রাসূলে খোদার (স.) প্রতি বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা পোষণ করায় আল্লাহর পক্ষ হতে কঠিন শাস্তি আপতিত হয়েছে। এ ধরণের একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন ইবনে মান্দাই ইসফাহানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহ-এর বরাতে। তিনি আসমায়ে সাহাবা গ্রন্থের প্রণেতা। এ ছাড়াও হাদীস শাস্ত্রে আরো বেশি কিছু রচনা তাঁর রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, আমি সিরিয়ায় হাদীস শাস্ত্রের এক শায়খ এর দরবারে হাজির হই। উদ্দেশ্য, তাঁর কাছ থেকে হাদীস শোনা ও শিক্ষা লাভ করা। দেখতে পেলাম যে, তিনি নিজের সম্মুখে একটি পর্দা বেঁধেছেন। আমি বসে পড়লাম এবং পর্দার পিছন থেকে তাঁকে হাদীস শোনাতে লাগলাম। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে, তিনি সম্মুখে পর্দা কেন ঝুলিয়েছেন? হাদীস পাঠ যখন শেষ হলো এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমি ইবনে মান্দা, তখন বললেন-হে আবু আব্দুলাহ! তুমি কি কিছু জান? আমি কেন পর্দার আড়ালে বসে আছি? বললাম না। বললেন- আমি তোমাকে বিষয়টি জানিয়ে রাখছি। কারণ, তুমি একজন জ্ঞানী লোক এবং হাদীস চর্চাকারী ঘরাণার মানুষ। আমি একদিন আমার এক শায়খের সামনে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমার সামনে এই হাদীসটি পড়ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন যে,

اما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله تعالى رأسه رأس الحمار

لا يمكن الثناء كما كان حقه

উক্ত শায়খ হাদীসটির পুনরাবৃত্তি করেন এবং বিভিন্ন সূত্রে এটি রেওয়ায়েত করেন। আমার মধ্যে যে দূর্ভাগ্য ছিল, তার কারণে আমার মনে এই সন্দেহ জাগল যে, এটা কেমন করে হতে পারে? সে রাতে যখন ঘুমালাম এবং সকালে জাগ্রত হলাম, তখন আমার মাথাটি গাধার মাথার মত হয়ে গেল । এ

কারণে ওলামায়ে কেরামের মজলিসে হাজির হওয়া হতে মাহরূম হয়ে যাই। তালেবে এলম (ছাত্রদের) মধ্য হতে যে আমার কাছে আসে, আমি তার সাথে পর্দার আড়াল হতে কথা বলি। আমি যেহেতু তোমাকে ইলম ও আমল-ওয়ালা লোক হিসেবে জানি, সেহেতু এই রহস্যটি তোমার কাছে ব্যক্ত করছি। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ওয়াদা কর যে, যতদিন জীবিত আছি, কাউকে এই রহস্যের কথা বলবে না। আমি মারা গেলে বলবে। যাতে লোকেরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের হাদীস পড়ার সময় আদবের সাথে থাকে এবং মনে কোনরূপ সন্দেহ স্থান না দেয়। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ওয়াদা করলাম। তখন তিনি তাঁর সম্মুখ হতে পর্দাটি উঠালেন এবং নিজেকে দেখালেন। তাঁর দেহ ছিল মানুষের দেহের মত আর মাথা ছিল গাধার মাথার মতো। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন এ কথা আমি কাউকে বলিনি (জামি, ২০০০: ৩১০-৩১১)।

আল্লাহর পরে তিনিই শ্রেষ্ঠ

"তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ আমি (রাসুল স.) তোমাদের কাছে তোমাদের নিজের, আপন সন্তান- সন্ততি, পিতা-মাতা ও সকল মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় না হবেন আল-বাগবি, ১৯৮৬: ১ম খণ্ড, ৫)। নবিকরিম (স.) এর এই ঘোষণা অনুযায়ী রাসুল (স.) এর প্রতি প্রেম ও ভালবাসা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে এই ভালবাসা দেখাতে গিয়ে কেউ কেউ এত অতিরঞ্জিত করে যে, খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.) এর বেলায় যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছে, নবিজি (স.)-কেও তাঁর কাছাকাছি প্রশংসায় সিক্ত করা হয়। আবার অনেকে তাওহিদের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে হযরতের (স.) মর্তবাকে খাটো করে। এ পর্যায়ে ভারসাম্যপূর্ণ আকিদাটি আমরা পাই মাওলানা আব্দুর রহমান জামির (স.) কাছ থেকে। আমাদের দেশে মিলাদুন্নবি (স.) মাহফিলসমূহের সমাপনীতে আরবি ভাষায় একটি চতুষ্পদী পাঠ করা হয়। এর রচয়িতা নিঃসন্দেহে মাওলানা জামি (র.)। ওলামায়ে কেরামের মুখেমুখে এর চর্চা হলেও কোন গ্রন্থে এর লিখিত রূপ এ পর্যন্ত খুঁজে পায় নি। আমার অব্যাহত গবেষণায় কোন সূত্র পেলে তা সংযোজন করব। তবে বর্ণনা পরম্পরায় এই চতুষ্পদীটির আবেদন কালজয়ী ও অকাট্য ।মাওলানা জামি (র.) বলেন:

يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر

হে সৌন্দর্যের আধার! ওহে মানব জাতির সর্দার!
আপনার উজ্জল চেহারার সৌন্দর্যে চাঁদ আলোকিত।

لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از

بعد از بزرگ توئی قصه مختصر

আপনার যেরূপ প্রশংসা উচিত, সেরূপ কারো সাধ্য নাই

আল্লাহর পরে আপনিই শ্রেষ্ঠ, কথা এখানে শেষ।

উন্নত চরিত্রের সাক্ষ্য দিলেন সহধর্মীনী

হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় ফেরেশতা জিব্রাইল (আ.) ওহি নিয়ে আসেন মহানবির (স.) কাছে। বুখারী মুসলিমসহ সকল হাদীস তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থে এ ঘটনা বিধৃত। প্রথম ওহি লাভের পর কম্পিত দেহে মহানবি (স.) ফিরে আসেন আপন গৃহে হযরত খাদিজার (র.) কাছে। বললেন, আমার কেমন যেন ভয় হচ্ছে। তোমরা আমাকে চাদর মুড়িয়ে দাও। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতে সহধর্মীনী হযরত খাদিজাতুল কুবরা (র.) তাঁকে অভয় দিলেন আর তাঁর সুমহান মানবীয় চরিত্র সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করলেন, যা তাঁর অনুপম চরিত্রের পক্ষে সহধর্মীনীর কালজয়ী সাক্ষী। বড় ও মহৎ অনেক মানুষ আছে, যারা অন্য মানুষের নজরে বড়। কিন্তু পুরুষের চরিত্রের সকল দুর্বল দিক আপন স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে বিদায় স্ত্রীর কাছে সম্মানিত ও প্রশংসিত হওয়ার চেয়ে উত্তম সার্টিফিকেট আর হতে পারে না। মওলানা জামি (র.) এ পর্যায়ে হযরত (র.) মন্তব্যগুলো উদ্ধৃত করেন। হযরত খাদিজার (র.) মন্তব্য, আমার বিশ্বাস আল্লাহ আপনার মঙ্গল চান। পরক্ষণে সহধর্মীনী খাদিজা তাকে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে যান। ওয়ারাকাও সাক্ষ্য দিলেন যে, আপনার প্রতি ঐ পবিত্র সত্তা এমনিভাবে অবতীর্ণ হবেন এবং আপনি এই উম্মতের পয়গাম্বর। এমন কি হযরতের স্বজাতি তাঁকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করবে ভবিষ্যতবাণী করে তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। ইতিহাস সাক্ষ্য যে, সহধর্মীনী খাদিজাই আপন স্বামীর নবুয়াতের ওপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করেন (জামি, ২০০০: ১৩৯-১৪০)।

মুহাম্মদের (স.) প্রশংসায় আব্দুল মুত্তালিব

মওলানা জামি (র.) তার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত' গ্রন্থে। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (র.) বর্ণনা করেন যে, আব্দুল মুত্তালিবের জন্য কাবাগৃহের ছায়াতলে একটি কুরসি স্থাপন করা হয়েছিল। তার সম্মানার্থে সেখানে এক ব্যক্তি মোতায়েন থাকত। মহানবি (স.) শৈশবে সেই কুরসির ওপর এসে বসতে চাইতেন। তখন চাচা আবু তালেব তাঁকে বসার অনুমতি দিতেন না। আব্দুল মুত্তালিব বলতেন, আমার বৎসকে ডাক। আল্লাহর কসম তার মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ, সে যেখানে ইচ্ছা

বসতে পারবে। কারণ, তার সামনে রয়েছে বিরাট কাজ। আমার মনে হয়, সে কোনদিন তোমাদের সর্দার হবে। তার কপালে যে নূর রয়েছে তা সর্দার ও নেতা ছাড়া কারো ললাটে থাকতে পারে না। মওলানা জামি (র.) আরো বর্ণনা করেন যে, আব্দুল মুত্তালিব পৌত্রকে কাঁধে বসিয়ে কাবা শরীফ তওয়াফ করতেন এবং যখন টের পেতেন যে, তিনি প্রতিমাদের অপছন্দ করেন তখন তাঁকে প্রতিমাদের সামনে নিয়ে যেতেন না।

মওলানা জামি (র.) এর বিভিন্ন লেখনিতে রাসুল (স.) ও আহলে বাইত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এ ধরণের কয়েকটি বইয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো, মওলানা জামি ৮৭৩ হিজরী হতে হজ্বের সফরের বছর ৮৭৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি এই কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। কুরআন মজীদের আয়াত হাদীস আর ইমামগণ ও বুজুর্গানে দ্বীনের উক্তির ব্যাখ্যা সম্বলিত এই কাব্যগ্রন্থে জব ও ইখতিয়ার, নিয়তি, নবুয়াত, ইমামত, জগতের প্রাচীনত্ত্ব ও নতুনত্ব প্রভৃতি কালাম শাস্ত্রীয় বিষয় উপস্থাপন করেছেন। আর শরিয়তের বিধানাবলি-যেমন নামাজ, রোযা, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতির নিয়মাবলি আর জিকির, নির্জনবাস, নীরবতা, ক্ষুধা প্রভৃতির মতো আধ্যাত্মিক বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে নানা ঘটনা ও গল্প কাহিনীর আদলে। শেষভাগে আপন মুর্শীদের ছেলে উবায়দুল্লাহ আহরার এর অনুরোধে ইতেকালনামা নামে ইসলামি আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কিত একটি পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করেন । এর প্রথম বেইত-

الله الحمد قبلك لكلام

بصف اتالجل الوالاكرام

জামি (র.) রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত আহলে বাইত সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে নিম্নে আালোচনা করা হলো:

সাবহাতুল আবরার

হিজরি ৮৮৮ সালে এই কাব্যগ্রন্থটি রচিত এবং সুলতান হুসাইন কায়কারা-র নামে উৎসর্গিত। চল্লিশটি আকদ বা বিষয়ে বিন্যস্ত কিতাবটির বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে মনের হকিকত, বাগ্মিতার স্বরূপ, অস্তিত্বের হাকিকত, তাসাউফ, ভক্তি, তওবা, দুনিয়া বিরাগ, দারিদ্র, সবর, শোকর, ভয়, তাওয়াক্কুল, রেখা, মহব্বত, প্রেরণা, আত্মমর্যাদা, লজ্জা, মুক্তচিন্তা, সততা, প্রফুল্লতা, সামা, রাজা, বাদশাহদের রাজত্ব বিলাস, সুলতানদের প্রতি প্রজাদের কৃতজ্ঞচিত্ততা প্রভৃতি। অতীব সূক্ষ্ম ও মননশীল কাব্যগ্রন্থটির কাব্যরীতি স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্কর। কিতাবের শুরু এভাবে-

ابتدى باسم اله الرحمن الرحيم المتوالي الاحسان

দিওয়ানে কাসায়েদ ও গাজালিয়াত

মওলানা জামি (র) মোট তিনবার তার কাব্যগ্রন্থ দিওয়ান প্রণয়ন করেন। প্রথম দফা হিজরি ৮৮৪ সালে। দিওয়নের প্রথম ভাগ ভূমিকার অংশে কবিতার সৌন্দর্য ও গুণাবলির বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে কুরআন ও হাদীসের সাক্ষ্য-প্রমাণ; বিশেষ করে কবি ও কবিতার নিন্দায় বর্ণিত আয়াত ও হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা আর কবি ও কবিতার প্রশংসায় হযরত রসুলুল্লাহ (স) এর হাদীসের উদ্ধৃতি এনেছেন। এই গ্রন্থে তিনি তার করিনাম জানা এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, জন্মস্থান বেলায়তে জাম ও শেখুল ইসলাম আহমদ জামির সমাধিস্থল এর সূত্রে- যার রূহানী তাওয়ালুহকে জামি তার কাব্য-প্রতিভার ঝর্ণা উৎস মনে করেন, তিনি 'জামি' কবিনাম ধারণ করেছেন শুরু করেছেন এভাবে-

هست صلای سر خوان کریم بسم الله الرحمن الرحیم

گوید بسم الله، دستی بیار خوان کرم کرده کریم آشکار

দ্বিতীয় পর্যায়ে, পরের বছর ৮৮৫ সালে তিনি আরেকটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেন। তাতে দিওয়ানটি সংকলনের কারণ ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে একটি ভূমিকা পেশ করেন। তার দু'টি পংক্তি-

بسم اله الرحمن الرحیم املی حمد المنان الکریم

آنکه باین نکته سنجیده گشت فاتحه آرای کلام قدیم

তৃতীয় পর্যায়ে, মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে ৮৯৬ হিজরিতে আপন কাব্যগ্রন্থকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করেন এবং একে তিনটি নামে ভাগ করেন। যেমন যৌবনকালে রচিত কবিতাসমূহ 'ফাতেহাতুশ শাবাব, দ্বিতীয় ভাগে জীবনের মধ্যভাগে রচিত কবিতাসমূহ 'ওয়াসেতাতুল আকদ' এবং শেষ জীবনের রচনাবলি 'খাতেমাতুল হায়াত'। এই নতুন বিন্যাস কবি আমীর খসরু দেহলভির অনুকরণে এবং একান্ত শিষ্য ও বন্ধু প্রধানমন্ত্রী আমির আলী শির নওয়ায়ির অনুরোধে সম্পন্ন করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। উপরোল্লিখিত তিনটি দিওয়ানের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে পাঁচ ধরনের কবিতা।

ক. কাসায়েদ; এর বিষয়বস্তু হচ্ছে তাওহিদ, নাতে রসূল (স), ইমামগণের প্রশংসা, আধ্যাত্মিক ও চরিত্র বিষয়ক বিষয়াদি, সমকালীন শাসকদের প্রশংসা ও শোকগাঁথা।

খ. মাসনবি ও তারজি কাব্য; এই অংশটি অপেক্ষাকৃত ছোট।

গ. মুকাত্তিয়াত; উপদেশ ও রসাত্মক বিভিন্ন উপদেশ সম্বলিত ছোট্ট কলেবরে এই অংশটি সাজানো।

ঘ. রূবাইয়াত; সুফিতাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম ও প্রেমতত্ত্ব বিধৃত হয়েছে এ রুবাইয়াত বা চতুষ্পদী অংশে।

৬. শরহে জামি: আরবি ব্যাকরণ 'নাহু' এর একটি উচ্চতর কিতাব। অর্থ জামির শরাহ। এটি আল্লামা ইবনে হাজেব[৩৭] রচিত গ্রন্থ 'কাফিয়া' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। আমির নিজাম উদ্দিন আলী শির এর অনুরোধে মওলানা জামি তার সময় থেকে পূর্বেকার বুজুর্গগণের জীবনচরিত ভিত্তিক এ গ্রন্থটি রচনা শুরু করেন ৮৮১ হিজরিতে। ৫৮২ জন বুজুর্গ সুফি ও ৩৪ জন মহিলা বুজুর্গের জীবনী সম্বলিত এই গ্রন্থটিতে তাদের জীবনচরিত, তাসাউফ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি, অভিমত, কারামাত, শিক্ষা আর ঘটনাবলি তুলে ধরা হয়েছে। শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র)-এর তাযকিরাতুল আউলিয়ার আদলে লেখা এই গ্রন্থটি। গ্রন্থটি হিজরি নবম শতকের ফারসি গদ্য সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

উপসংহার

উপসংহার

ইসলাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির ধর্ম। মহানবির পবিত্র পয়গাম বিশ্বে বিশেষ কোন দেশ, জাতি, ধর্ম বা গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। মহানবি (স.) এর জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব ধ্বনিত হয়েছে বিশ্বের সকল জাতির কবি সাহিত্যিক পণ্ডিত ও দার্শনিকের কলমের কালিতে। নবি সৌন্দর্যের পরম সত্যের প্রকাশ উপমার কাব্যিকতায় প্রকাশ পেয়েছে। যেমন,

تو مقایسه اي اي رسول

میلیون ها ستاره، سیاره،

ستاره یا معادل آنها

تو چراغ معجزه نوراني پر از عزت والا و نجیب

تو جزیره رهایي و رفاه هستي در جهان پرتلاطم.

তোমার তুলনা তুমি হে রাসুল

লক্ষ তারা গ্রহ নক্ষত্র নয়তো তোমার সমতুল্য

তুমি সুউচ্চ সুমহান মর্যাদার পরিপূর্ণ দীপ্তময় অলৌকিক প্রদীপ

ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অশান্ত পৃথিবীতে তুমিই মুক্তি ও কল্যাণের দ্বীপ।

আমরা যদি নবির একনিষ্ঠ আশেক হতে চাই, তাহলে নবিজির সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে এবং সর্বাবস্থায় নবিজির প্রতি বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে। কারণ, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ''যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে আমাকেই ভালবাসলো।" অপর হাদীসে তিনি বলেন, 'যে আমার প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করবে, সে পরকালে আমার বেশি নৈকট্য লাভ করবে। ফারসি কাব্যসাহিত্য জগতে যেসব অমর কবি তাঁদের তেজস্বী লেখার মাধ্যমে মহানবির শান, মর্যাদা ও জীবনচরিত তুলে ধরেছেন তাঁদের জীবন ছিল রাসূলের আদর্শে অনুপ্রাণিত। আমলের ময়দানে তাঁরা ছিলেন রাসূলের যোগ্য অনুসারী। তাঁদের কবিতা পড়ে আমরা যদি তাঁদের মতোই রাসূলের জীবনকে আমাদের জীবনের আদর্শ হিসাবে গড়ে তুলতে পারি তাহলেই সার্থক হবে আমাদের জীবন।

আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে মর্যাদা ও ফজিলত সাব্যস্ত করেছেন বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছড়ি না করে তাঁর জন্য তা সাব্যস্ত করা। মনে রাখতে হবে তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল এবং তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মহানজন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন!, কবি বলেন,

এই টুকুনে তুষ্ট থাকো

তিনিই সেরা সৃষ্টি খোদার
মানব বটে; তবু ধরায়
নেই যে কোনই তুলনা তাঁর।

যে সব মহামনীষী ইসলামি শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিন্তা ও মননকে যুগে যুগে সমৃদ্ধ করে ভবিষ্যতের আলোকোজ্জ্বল পথ রচনা করেছেন মাওলানা আব্দুর রহমান জামি (র.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ফারসি ও আরবি সাহিত্যে অসামান্য অবদানসহ প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসাকে নানা আঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলে তিনি মুসলিম সমাজের চিন্তা ও চেতনাকে যেভাবে অলংকৃত করেছেন আমি আমার অভিসন্দর্ভে তাঁর একটি সঠিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে জামি (র.) রচিত মূল গ্রন্থাবলি, কবিতাসমগ্র ও ইরানি গবেষকদের রচিত ফারসি ভাষার গ্রন্থাবলি চয়ন করে প্রাথমিক সূত্র হতে সরাসরি তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারায় এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলে আমার আত্মবিশ্বাস। এই গবেষণাকর্মটি আমাদের মন, ঈমান ও চরিত্রকে সুন্দর করবে এবং নবি (স.) এর প্রেমের সূত্রে সমাজ জীবনে প্রেম-ভালবাসার আবহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। একটি কথা রূঢ় হলেও সত্য যে, নানা কারণে বাংলাদেশের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচরণ ও মূল্যবোধে দীর্ঘকাল থেকে বিরাজিত প্রেমপ্রীতির ওপর বর্তমানে এক প্রবল ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ইসলামকে আল্লাহ ও রাসূলের (স.) ভালবাসা-শূন্য নিছক আচার অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করার একটা প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। এর ফলে এক শ্রেণির ধর্মপ্রাণ লোকের মধ্যে রুক্ষতার প্রাদুর্ভাব ঘটছে; যার ভয়াবহ একটি রূপ হচ্ছে ধর্মের দোহাই দিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা। একে রোধ করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়, আবহমানকাল হতে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণে বিদ্যমান প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রসার ঘটানো। তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের (স.) প্রেমের পথ ধরে এর ফল্গুধারা আমাদের ধর্মীয় ও সমাজ জীবনকে কলুষমুক্ত রাখতে পারবে। কাজেই জামির মতো মনীষীদের লেখনিকে উপজীব্য করে রাসুল (স.) প্রেম, ভক্তিবাদ ও আধ্যাত্মিকতার চর্চা যত ব্যাপক হবে, দেশ ও জাতি ততই উপকৃত হবে। আমার এ ক্ষুদ্র অথচ মৌলিক গবেষণা দেশ ও জাতির এই খেদমতে নিবেদিত হলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. ইরানের মধ্যভাগের বিস্তৃত এক প্রদেশের নাম ইসফাহান। ইসফাহান ইতিহাসে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসফাহানকে বলা হত 'নিসফে জাহান' বা দুনিয়ার অর্ধেক। সাফাভি যুগে হিজরি ১০০৬ খ্রিস্টাব্দে ইরানের রাজধানী করা হয় ইসফাহানকে। তেহরানের পর ইরানের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল শহর ইসফাহানের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে ইতিহাস খ্যাত যায়িন্দারূদ (যায়িন্দা নদ)। ঐতিহাসিক নিদর্শনের বিচারে ইরানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নগরী ইসফাহান।

২. ইরানের মাশহাদ প্রদেশের ৭টি উপজেলার মধ্যে একটির নাম জাম বা তুরবর্তে জাম। এর পূর্ব সীমানায় রয়েছে ইরান ও আফগানিস্তান সীমাজে অবস্থিত হারিহ্রদ নদী। তুরবর্তে জাম এর কেন্দ্রস্থল মাশহাদ (বর্তমান খোরাসানের রাজধানী) হতে ১৪৪ কিলোমিটার দূরত্বে এবং আফগানিস্তান সীমান্ত হতে ৬৬ কিলোমিটার ব্যবধানে অবস্থিত। সেখানে বিখ্যাত আরেফ শেখ আহমদ জাম এর সমাধি অবস্থিত।

৩. জামির জন্মস্থান খারগার্দ এর আরবি উচ্চারণ খারজার্দ। কারণ আরবিতে গ অক্ষর নেই। বরং 'গ' কে জ (জাম) উচ্চারণে পড়া হয়। যেমন আব্দুল কাদের গিলানী এর নাম বলা হয় আব্দুল কাদের জিলানী। 'গিলানকে বলা হয় 'জিলান'। আফগানিস্তানের দিক থেকে ধারগার্ল বা বারজান হচ্ছে হেরাত এর দৃশাঙ্গ-এর নিকটবর্তী একটি শহর, যা হেরাত সংলগ্ন ইরানের আফগানিস্তান সীমান্তে অবস্থিত। অর্থাৎ জাম এর খারজান বা হেরাত এর পূশাঙ্গ এর নিকটবর্তী ফারজান অভিন্ন। এই ইতিহাস ৬শ বছরের পুরনো হলেও জাম বা তুর্বতে জাম তার প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে ইরানের খোরাসান প্রদেশের পূর্বাঞ্চলীয় আফগানিস্তান সীমান্তে এখনো বিদ্যমান।

৪. শায়খুল ইসলাম আহমদ জামি: তাঁর পুরো নাম আবু নসর আহমদ ইবনে আবুল হাসান। তিনি বিশিষ্ট ইবনে আব্দুলাহ (র.)-এর বংশের সন্তান ছিলেন। হযরত জারির (র.) নবিকরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের বছর ঈমান আনয়ন করেন । হযরত শায়খুল ইসলাম আহমদ জামি ইলমে লাদুন্নী (খোদা প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান)-এর অধিকারী ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিকতা ও আত্মার রহস্যজ্ঞান সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সবগুলো কুরআন হাদীস ভিত্তিক ছিল এবং কখনো কোনো আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি তার রচনাবলির বিরোধিতা করেন নি। তাঁর একটি কিতাবের নাম 'সিরাজুস সায়েরীন'। বিখ্যাত সুফি শেখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের এর সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্যতা ছিল। শেখ আবু সাঈদ এর ইন্তিকালের পর হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.) হতে পূর্ব পুরুষদের সূত্রে প্রাপ্ত ফিরকা (আচকান)টি ওসিয়ত সূত্রে শায়খুল ইসলাম লাভ করেন। মোটকথা তিনি অতি উঁচু স্তরের ওলি আল্লাহ ছিলেন। তাঁর জন্ম হিজরি ৪৪১ সালে ও মৃত্যু ৫৩৬ সালে।

৫. সা'দ উদ্দিন মুহাম্মদ কাশগরি: নকশবন্দিয়া তরিকার বিখ্যাত পির মুর্শিদ এবং মওলানা জামিরও পির। মওলানা জামি (র.) তাঁর রচিত 'নাফাহাতুল ঊনস' জীবন চরিত গ্রন্থে ও কবিতায় তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি হিজরি ৮৬০ সালে ৭ জমাদিউস সানি বুধবার ইন্তেকাল করেন। কাশগরির ইন্তিকালের পর মওলানা জামি তার স্থলাভিষিক্ত হন। জামি ইন্তিকালের পর আপন পির মুর্শিদ মওলানা কাশগরির কবরের পাশে আফগানিস্তানের হেরাত অঞ্চলে সমাহিত হন।

৬. কাজিজাদা রুমি ছিলেন সামারকান্দের বিশিষ্ট আলেম। তাঁর দরসে বড় বড় আলেম উপস্থিত হতেন। সামারকান্দ যাবার পর মওলানা আব্দুর রহমান জামিও তার দরসে হাজির হতেন। তিনি এই নতুন শিষ্যের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭. আমীর তৈমূর গুরকান এর ছেলে উমর শেখ এর পুত্র সুলতান হুসাইন বায়কারা (Bayqara) ছিলেন তৈমূর বংশের সর্বশেষ শক্তিমান সুলতান। যিনি দীর্ঘ ৩৫ বছর পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে পূর্ব ইরান শাসন করেন এবং তার রাজত্বের ছায়াতলে খোরাসান পূর্ণ আবাদ ও জ্ঞানচর্চা ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ছিল। মওলানা জামির সাথে সুলতানের অতুলনীয় বন্ধুত্ব ছিল। সুলতান ছিলেন জামির ভক্ত ও অনুরক্ত। জামির (র.) ইন্তিকালের ১০ বছর পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

৮. আমির নিজামুদ্দিন আলী শির ছিলেন সুলতান হুসাইন বায়কারার একান্ত সভাসদ ও মাকদামে ওমারা বা প্রধানমন্ত্রী। সুলতানের কাছে তার মতামতের বিশেষ মর্যাদা ছিল। আমীর নিজে জ্ঞানী, পণ্ডিত, কবি ও সম্পদশালী ছিলেন। তাঁর যত্নে খোরাসানের রাজ দরবার জ্ঞানী গুণীদের গুলজারে পরিণত হয়েছিল। জামির সাথে তার সম্পর্ক ছিল পরস্পর বন্ধুজামি হিজরি নবম শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে গণ্য।

৯. বুখারার নিকটবর্তী মধ্য এশিয়ার একটি প্রাচীন নগরীর নাম সামারকান্দ। বর্তমানে উজবেকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।

১০. বাহাউদ্দিন নকশবন্দীর পুরো নাম বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ বুখারী নকশবন্দী (৭১৮ ৭৯১ হিজরি)। তিনি হিজরি অষ্টম শতকের বিখ্যাত সুফি ও আধ্যাত্মিক গুরু । আধ্যাত্মিক সাধনার নকশবন্দিয়া তরিকার তিনি প্রবর্তক। মধ্য এশিয়ায় বুখরার নিকটবর্তী 'কাসরে আরেফান' (তত্ত্বজ্ঞানীদের প্রাসাদ) নামক মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তার অসংখ্য মুরিদানের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত দু'জন ছিলেন খাজা আলাউদ্দিন আতা ও খাজা মুহাম্মদ পারসা। তার তরিকার ঊর্ধ্বতন সূত্র বিখ্যাত সুফি ও তত্ত্বজ্ঞানী বায়েজিদ বোস্তামীর সঙ্গে যুক্ত। তার বিখ্যাত দু'টি কিতাব আধ্যাত্মিকতায় "দালিলুল আশেকিন' ও উপদেশমূলক জীবন চরিত 'হায়াতনামা'। কাসরে আরেফিনে বিশ্বের সর্বত্র তার সিলসিলার বিপুল অনুসারী রয়েছে।

১১. হেরাত; প্রাচীন খোরাসানের অন্যতম সমৃদ্ধ শহর। ইসলামের আবির্ভাবের পর এ শহরটি ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে তৈমূর বংশীয় সুলতানদের রাজধানীতে পরিণত হয়। বর্তমানে আফগানিস্তানের উত্তর পশ্চিমে জারিরুদ নদের তীরে অবস্থিত এবং বহু আরেফ ও সুফিরজন্মস্থান ও সমাধিস্থল হওয়ার সুবাদে ইতিহাসে বিখ্যাত।

১২. মার্ভ: প্রাচীন খোরাসানের একটি নগরী।

১৩. তাশখন্দ: মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত উজবেকিস্তানের বর্তমান রাজধানী। প্রাচীন ইসলামি নগরী।

১৪. হামাদান: বর্তমান ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় হামাদান প্রদেশের রাজধানী। ইরানের পৌরানিক রাজবংশ 'মান'দের রাজধানী ছিল। হামাদান শহরের কেন্দ্রস্থলে ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ ও মনীষী শেখর রইস আবু আলী সীনা প্রকাশ ইবনে সীনার সমাধি অবস্থিত।

১৫. নাজাফ: ইরাকের পূর্বাঞ্চলীয় প্রাদেশিক কেন্দ্র কারবালার অন্তর্গত ও ৭৫ কিলোমিটার ব্যবধানে অবস্থিত নগরী নাজাফ চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (র.)-এর মাজারের জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে শিয়াদের ধর্মীয় শিক্ষা ও মাদ্রাসার অন্যতম প্রাচীন কেন্দ্র।

১৬. তাবরীয়: ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের প্রাদেশিক কেন্দ্র ও ঐতিহাসিক প্রাচীন শহর।

১৭. নিশাপুর: ইরানের পূর্বাঞ্চলীয় খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত জিলা। প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় শহর নিশাপুর ইতিহাসে অন্যতম ইসলামি জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত। প্রখ্যাত আরেফ ফরিদুদ্দিন আত্তার ও বিশ্ববিখ্যাত কবি ওমর খৈয়ামের মাজার এই প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের মাঝে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

১৮. সাবযাওয়ার: খোরাসান প্রদেশে অবস্থিত নিশাপুর ও শাহরুদ শহরের মধ্যবর্তী একটি শহরের নাম সারযাওয়ার। ইসলামের প্রথম যুগে এই শহরটি 'বায়হাক' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এটি

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল এবং ইমাম বায়হাকির মতো বিশিষ্ট ইসলামি মনীষীবৃন্দ এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেন।

১৯. বাস্তাম: ইরানের পূর্বাঞ্চলীয় শহরূদ জেলার অন্তর্গত অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন নগরী। মোগলদের আক্রমণে এই শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। বিশ্ববিখ্যাত আরেফ হযরত বায়োজিদ বোস্তামীর জন্মস্থান এই বাস্তাম। এখানেই তার মাজার অবস্থিত। বাস্তামের প্রাচীন উচ্চারণ বোস্তাম।

২০. দামেগান: ইরানের পূর্বাঞ্চলীয় ঐতিহাসিক প্রাচীন নগরী দামেগান। পূর্বে শহরটি অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিছুকাল ইরানের আশকানী রাজবংশের রাজধানী ছিল। প্রত্মতত্ত্ব ও প্রাচীন নিদর্শনাবলীর জন্য বিখ্যাত ।

২১. সেমনান: ইরানের বর্তমান রাজধানী তেহরান হতে সোয়া দুইশ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। সেমনান একটি প্রাচীন নগরী।

২২. কাযবিন: ইরানের মধ্য প্রদেশের অন্যতম জেলা শহর। সাফাভি আমলের শুরুর দিকে কিছুকাল ইরানের রাজধানী ছিল। ইরানের অন্যতম ঐতিহাসিক নগরী।

২৩. খাজা আহরার; পুরো নাম নাসিরুদ্দিন খাজা ওবায়দুলাহ ইবনে মাহমূদ ইবনে শাহাব উদ্দিন প্রকাশ খাজা আহবার। তিনি নকশবন্দিয়া তরীকার বিখ্যাত শেখ। তিনি শেখ ইয়াকুব চার্খী ও নিজাম উদ্দিন খামুন এর কাছ থেকে ইরশাদ (দীক্ষা) লাভ করেন। তুর্কিস্তান ও খোরাসানের রাজা বাদশাহগণ, বিশেষ করে সুলতান আবু সাঈদ তার প্রতি গভীর। শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি হিজরি ৮৯৬ সালে সামারকান্দে ইন্তেকাল করেন।

২৪. ওসমানী সম্রাট বায়েজিদ খান - দ্বিতীয় (শাসনকাল ৮৮৬ হিজরি/১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ-৯১৮ হিজরি/১৫১২ খ্রিস্টাব্দ)।

২৫. ফোরীন: স্বর্ণ মাপের ওখন বিশেষ। এখনো তা একই নামে হল্যান্ডে প্রচলিত আছে।

২৬. শেখ সদরুদ্দিন কূনাভী; পুরো নাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী। তিনি বিখ্যাত আরেফ (তত্ত্বজ্ঞানী) ও মনীষী ছিলেন। মৃত্যু ৬৭১ বা ৬৭৩ হিজরি মোতাবেক ১২৭৩/১২৭৫ খ্রিষ্টাব্দ । জাহেরি ও বাতেনি ইলম এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনামূলক জ্ঞানে তিনি সুদক্ষ ছিলেন।

২৭. মুয়াইয়াদ উদ্দিন জুনদী; তিনি শেখ সদরুদ্দিন কূনাভীর ছাত্র। জাহেরী ও বাতেনি ইলমে পরিপক্ষ ছিলেন এবং তিনিই ইবনুল আরাবি রচিত *ফুসুস আল হিকাম* এর সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাদাতা।

২৮. শেখ সা'দ উদ্দিন সায়ীদ আল ফারগানী; সদরুদ্দিন কুনাভীর অন্যতম শাগরেদ। তিনি ইবনে ফায়েদ মিসরী (৫৭৬ ৬৩২ হিজরি) এর কাসিদায়ে ভাইয়া এর ব্যাখ্যা করেন।

২৯. সাদি; বিশ্ববিখ্যাত ইরানি কবি শেখ মুশাররফ উদ্দিন মুসলেহ ইবনে আব্দুল্লাহ শিরাজি। ইন্তেকাল ৬৯১ ও ৬৯৫ হিজরির মধ্যবর্তী সময়ে। ইরানের শিরাজ নগরীতে তার সমাধি অবস্থিত। বিশ্ব সাহিত্যের অলংকার *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* তার অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি শ্রেষ্ঠ গজল গায়ক কবি।

৩০. হাফিজ; মহাকবি খাজা শামসুদ্দিন মুহাম্মদ হাফিজ শিরাজি: ইরানের শিরাজ নগরীতে তার সমাধি অবস্থিত। তার কাব্যগ্রন্থ *দিওয়ানে হাফিজ* বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি আরবি সাহিত্য ও কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞানে পণ্ডিত ও হাফেজ ছিলেন। আনুমানিক ৭৯২ হিজরিতে শিরাজে ইন্তেকাল করেন। শিরাজে তার সমাধিস্থলের নাম হাফিজিয়া। গজলকাব্যে তাকে শেখ সাদির সমকক্ষ মনে করা হয়।

৩১. খাজা আবু সাঈদ; হিজরি চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের বিখ্যাত সুফি ও কবি। জন্ম ৩৫৭ হিজরি ও মৃত্যু ৪৪০ হিজরি। তিনিই সর্বপ্রথম খোরাসানে তাসাউফের নীতিমালার বিস্তার ঘটান এবং

Dhaka University Institutional Repository

খানকাহসমূহে 'সামা' (আধ্যাত্মিক সঙ্গীত) এর প্রচলন করেন। তার রচিত *আসরারুত তাওহিদ* সুফিতত্ত্বের ওপর প্রথম সারির কিতাব ।

৩২. খৈয়াম; হাকিম আবুল ফাতাহ ওমর ইবনে ইব্রাহীম খৈয়াম। তিনি হিজরি পঞ্চম শতকের শেষ ও ষষ্ঠ শতকের শুরুর দিকের বিখ্যাত ইরানি দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও কবি ছিলেন। জন্ম নিশাপুরে এবং নিশাপুরেই তার সমাধি অবস্থিত। *রুবাইয়াত* এর জন্য তিনি কবি হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত।

৩৩. সানায়ি; হিজরি ৬ষ্ঠ শতকের বিখ্যাত ইরানি কবি আবুল মাজিদ মাজদুদ ইবনে আদম সানায়ি। ৫২৫ হতে ৫৪৫ হিজরির মধ্যবর্তী সময়ে ইন্তেকাল করেন। তার মাজার গজনি-এ সর্বস্তরের লোকদের জিয়ারতের স্থান। এখানে বসেই তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে *হাদিকাতুল হাকিকা* মসনবি কাব্য রচনা করেন।

৩৪. হাদীসটির ভাষা 'লাউ লা-কা লমা খালাকতুল আফলাক।' হাদীসটি হাদীসে কুদসি হিসেবে প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচারিত। অবশ্য হাদীসবেত্তাদের মধ্যে কেউ কেউ একে জাল হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর কাছে সামগ্রিকভাবে বরণীয় মনীষীদের রচনায় এই হাদীসের বারবার উদ্ধৃতি ও উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় যে, এটি হাদীস হিসাবে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য। বিশেষ করে সুফি ভাবধারার প্রায় সকল মনীষী একে হাদীস হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাঁদের চিন্তা ও কবিতার মূলধন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। (দ্রষ্টব্য শেখ সাদি, *বুস্তান*, জাভিদান প্রকাশনী, তেহরান, ইরান-১৯৮৭, পৃ. ৫৩/ মওলানা জালালুদ্দিন রুমি, *মসনবি শরীফ*, বেইত ২/৭৯৩, ৫/২৭৪১, ৬/১৬৭১, ২৮৯৭)।

৩৫. আব্দুল গফুর লারি: বিশিষ্ট সুফি ও মনীষী। জন্ম হেরাতে ৯১২ হিজরিতে। তিনি জামির মুরিদ ও শিষ্য। জামির *নাফাহাতুল উনস* এর উপর তিনি টীকা লিখেন। তার কবর হেরাতে তার মুর্শিদ জামির কবরের পাশে অবস্থিত।

৩৬. হাবিবুস সিয়র: ফারসি ভাষায় *খান্দমির* রচিত সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ। মানব ইতিহাসের শুরু থেকে শাহ ইসমাঈল সাফাভির মৃত্যু পর্যন্ত (৯৩০ হিজরি) ইতিহাস তাতে বর্ণিত হয়েছে। তিন খণ্ডে বিন্যস্ত গ্রন্থটির রচনাকাল ১২৭-৯৩০ হিজরি।

৩৭. ওয়ামান দাখালাহু কানা আমিনা যে তাতে প্রবেশ করবে, সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে'- এ বাক্যটিকে আবজাদ সংখ্যা তত্ত্বে বিশ্লেষণ করলে মাওলানা জামির মৃত্যুর তারিখ পাওয়া যাবে। জান্নাত সম্পর্কিত বাক্যটি কুর'আন মজিদের আয়াতাংশ।

৩৮.হাসান বেগ আগ কুনলু; পুরো নাম আবুন নসর হাসান বেগ প্রকাশ উথুন হাসান, তিনি আগ কুয়ুনল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই রাজবংশের সবচেয়ে শক্তিমান সুলতান। আজারবাইজানসহ ককেশাস অঞ্চল হতে নিয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম ইরান পর্যন্ত এই রাজবংশের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। তার শাসনকাল ছিল ৮৭৩ হতে ৮৮২ হিজরি পর্যন্ত।

৩৯. আনোয়ারীর: পুরো নাম আওহাদ উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ। উপাধি হুজ্জাতুল হক। হিজরি ষষ্ঠ শতকের বিখ্যাত ইরানি পণ্ডিত ও কবি। তিনি তৎকালীন প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষত হিকমত, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। চিন্তার ক্ষেত্রে ইবনে সিনার অনুসারী ও পক্ষপাতি ছিলেন। সঞ্জর রাজবংশের সময় তিনি সুলতানের প্রশংসায় কাব্যচর্চা করেন আর সুলতানের মৃত্যু ও খোরাসানে গায়ানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে আমির ওমরাদের প্রশংসা ও বিভিন্ন দেশ সফর করে বেড়ান। কবিতায় কাসিদা ও গজল রীতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তার কাব্যগ্রন্থ *দিওয়ান* পুনঃপুনঃ মুদ্রিত হচ্ছে। আনুমানিক ৫৮৩ হিজরি/১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৪০. মুইজি; হিজরি ৫ম শতকের শেষভাগ ও ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগের প্রসিদ্ধ ফারসি কবি আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালেক বুরহানি নিশাপুরী। তিনি সুলতান মুইজ উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

মালেকশাহ-এর দরবারে সভাকবি ছিলেন। সেই সূত্রে মুইজি কবি নাম ধারণ করেন। তার আমলের শেষ পর্যন্ত (৪৮৫ হিজরি) তিনি রাজদরবারে নিযোজিত ছিলেন। এরপর হেরাত, ইসফাহান, নিশাপুর প্রভৃতি অঞ্চলের রাজাবাদশাহদের প্রশংসায় কাব্যচর্চা করেন। কাসিদা রচনায় মুইজি অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। ৫১৮-৫২১ হিজরির মধ্যবর্তী সময়ে তিনি ইন্তেকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আল কুরআন

মুর্তজা ও গিলানী, আগা, মুদাররিস (১৯৮৭)। *মুকাদ্দামা মসনভি হাফতে আওরাঙ্গে জামি*। তেহরান: কিতাব ফরুশীয়ে সাদি।

হিকমত, আলী আসগর (১৯৮৪)। *জামি*। তেহরান: তূস প্রকাশনী, ।

মুঈন, ড. মুহাম্মদ মুঈন (১৯৮৫)। *ফারহাঙ্গে ফারসি*। তেহরান: আমীর কবীর প্রকাশনী।

ফাখুরি, হানা আল (১৯৮৮)। *তারিখুল ফালাসাফা আল আরাবিয়া* (ফারসি অনুবাদ : আব্দুলাহ মুহাম্মদ আয়াতী)। তেহরান, ইরান।

জামি, মওলানা আব্দুর রহমান। *লওয়ায়েহ দর ইরফান ও তাসাওফ*। তেহরান: ফুরুগি।

তাওহীদপুর, মেহেদী (১৯৮৭)। *জামির নাফাহাতুল উনস এর ভূমিকা*। তেহরান: সাদি প্রকাশনী।

নওয়ায়ী, নিয়াম উদ্দিন (১৯৮৪)। *মাজালিসুন নাফায়েস*। তেহরান।

জামি, মওলানা আব্দুর রহমান (১৯৮৭))। *সিলসিলাতুজ যাহাব*। তেহরান: কিতাব ফুরুশীয়ে সাদি।

জামি, আব্দুর রহমান (১৯৮৭))। *লাইলি ও মাজনুন*। তেহরান: কিতাব ফুরুশীয়ে সাদি।

আল হারাবী, ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবু সাঈদ (১৯৩১)। *মাজারাতে হেরাত*। হেরাত" দানিশে হেরাত প্রকাশনী।

জামি, মাওলানা আব্দুর রহমান (১৯৮৭)। *নাফাহাতুল উনস মিন হাদারাত আল কুদস*। তেহরান: সাদি প্রকাশনী।

জামি, মওলানা আব্দুর রহমান (২০০০)। *জামি (র.)*। তেহরান: শাওয়াহেদুন নবুয়াত।

জামি, মওলানা আব্দুর রহমান (অনু. মুহিউদ্দিন খান (২০০৭)। *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*। ঢাকা: মদিনা পাবলিকেশন্স।

আল-বাগবি, ইমাম হোসাইন বিন মসউদ আল-ফাররা (১৯৮৬)। *মিশকাতুল মাসাবীহ*। ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরি।

সুয়তী, আল্লামা জালাল উদ্দিন। *আসমাউল মাইয়াত*। তেহরান।

শিরাজি, শেখ মোসলেহ উদ্দিন সাদি (১৯৮৭)। *বুস্তান*। তেহরান: জাভিদান প্রকাশনী।

সামারে, ইয়াদুলাহ (১৯৯৫)। *আফা।* ঢাকা: ইরানি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

যাকারিয়া, শায়খুল হাদীস মাওলানা (অনু. মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম) (১৯৮৮)। *দরূদ শরীফের ফযীলত ও মাহাত্ম*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ।

জামি, মওলানা আব্দুর রহমান (১৯৮৭)। *মসনবি সালামান ও আবসাল*। তেহরান: সাদি প্রকাশনী।

সাদি, মওলানা (১৯৮৭)। *তোহফাতুল আহরার*। তেহরান: সাদি প্রকাশনী।

জামি, মওলানা আব্দুর রহমান (১৯৮৭)। *সাবহাতুল আবরার*। তেহরান: সাদি প্রকাশনী।

জামি, মওলানা আব্দুর রহমান (১৯৮৭)। ইউসুফ জুলাইখা। তেহরান: সাদি প্রকাশনী।

জামি, মওলানা আব্দুর রহমান (১৯৮৭)। *খেরদনামায়ে ইসকান্দারী*। তেহরান: সাদি প্রকাশনী।

বুসীরী, ইমাম শরফ আদ-দীন (১৯৮২)। *কাসিদায়ে মোবারকা বুর্দা*। তেহরান: ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রেডিও টেলিভিশন সংস্থা।

জামি, মওলানা আব্দুর রহমান (১৯৮৮)। *বাহারিস্তান*। তেহরান: এত্তেলাআত প্রকাশনী।

মুঈন, ড. মুহাম্মদ (১৯৮৫)। *ফরাহাঙ্গে ফারসি (ফারসি অভিধান)*। তেহরান: আমীর কবির প্রকাশনী।

শির, আমির আলী। *মারআতুল খেয়াল*। ভারত: বোম্বে মুদ্রণ।

জামি, মওলানা আব্দুর রহমান (১৯৭৩)। *আশআতুল লোমআত*। তেহরান: গঞ্জিনা প্রকাশনী।

জামি, মওলানা আব্দুর রহমান (১৯৮২)। *তারজুমায়ে কাসীদায়ে বোর্দা*। তেহরান: সুরূশ প্রকাশনী।

নদভী, মুহাম্মদ আব্দুলাহ হাই (২০০২)। *শানে হাবীবে ইলাহ*। চট্টগ্রাম: শাহ আব্দুল জব্বার আশ শরফ একাডেমী।

ইসলাম, কাজী নজরুল (১৯৮৪)। *নজরুল রচনাবলী*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

শাফাক, ড. রেজা যাদে (১৯৭৩)। *তারীখে আলাবিয়াতে ইরান* তেহরান: ইশরাকী প্রকাশনী।

জামি, মওলানা আব্দুর রহমান (১৯৮৭)। *মাসনাভি সালমান ও আবসাল*। তেহরান: সাদি প্রকাশনা।

জামি, মাওলানা আব্দুর রহমান (১৯৮৮)। *বাহারিস্তান*। (সম্পা. ড. ইসমাঈল হাকেমি)। তেহরান: ইত্তেলাআত প্রকাশনা।

জামি, মাওলানা আব্দুর রহমান (১৯৬২)। *দিওয়ানে জামি*। তেহরান: তূস প্রকাশনী।

জামি, মাওলানা আব্দুর রহমান। *আশআতুল লোমআত*। তেহরান: গঞ্জিনা প্রকাশনী, তেহরান।

Joel waiz lal, *An Introduction History of Persian literature*, Published by Atma & Son's, 2nd Edition, Delhi, India.

Edward. G. Brown (1969). *A Literary History of Persia*. The Cambridge University Press.

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%B2-%E0%A6%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B8

https://www.facebook.com/groups/1080150765893878/posts/1091161178126170/

https://www.facebook.com/groups/sipahsalar/permalink/791166521482270/

https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/smismailblog/30218087

https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/smismailblog/29310184

https://parstoday.com/bn/radio/programs-i85166